অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করন : জানুয়ারি ২০০৮

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন বিদ্যাধরী নদীর ধারে বটতলায় বসে ভুট্টা খাচ্ছিল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। দুজনেরই কাজ নেই। শঙ্কাহরণের খানিকটা জমি ছিল, সেটা মহাজন নিয়ে নিয়েছে। বিপদভঞ্জন কুমোরের কাজ করত, সেই ব্যবসা আর চলছে না। একটু আগে গদাধরবাবুর বাড়িতে কায়দা করে ঢুকে পড়েছিল দুজনে। আজ গদাধরবাবুর মেয়ের বিয়ে। রাতে বড় ভোজ। কিন্তু মেলা আত্মীয়কুটুম্ব আর কাজের লোকের জন্য দুপুরেও ঢালাও ব্যবস্থা। তারা ভেবেছিল ভিড়ের মধ্যে মিলেমিশে ভোজে বসে যাবে। তা বসেও ছিল। কিন্তু হঠাৎ নদেরচাঁদ আর কানাইবাঁশি তাদের দেখে চিলচেঁচানি চেঁচাতে লাগল, "অ্যাই, এরা তো কাজের লোক নয়! এরা তো উটকো লোক, ঢুকে পড়েছে খাওয়ার লোভে। বেরোও, বেরোও—"

দু'-একজন দয়ালু লোক থাক না, থাক না' বলছিল বটে, কিন্তু বাদবাকি সবাই খাপ্পা হয়ে এমন হুড়ো লাগাল যে, পালানোর পথ পায়নি তারা।

ভুট্টা শেষ হয়ে গেছে। দুজন বসে-বসে কথা কইছে। তাদের কথারও বিশেষ মাথামুণ্ডু নেই।

শঙ্কাহরণ দুঃখ করছিল, "বুঝলি বিপদ, লেখাপড়া শিখলে বোধ হয় কিছু সুবিধে হত।"

বিপদভঞ্জন বলল, "কথাটা আমিও ভাবি। তবে কিনা লেখাপড়া হল ভারী জিনিস। মাথায় সেঁদোলে মাথাটার বড্ড ওজন বেড়ে যায়।

ক্লাস টু'তে ওঠার পর রোজ ইশকুল থেকে ফেরার সময় আমার মাথা টাল খেত।"

"দুর বোকা! তা হলে গোপীপণ্ডিত, নরহরিমাস্টার, সুদাম তকালঙ্কার চলেফিরে বেড়াচ্ছে কী করে? তুই তো মোটে টু, আমি তো থ্রি টপকে প্রায় ফোরে উঠে গিয়েছিলুম আরকী। শ্যামাপদস্যার কাছে ডেকে আদর করে বললেন, সবাই ফোরে উঠে গেলে থ্রি যে একেবারে ফাকা হয়ে যাবে বাপ ! বাছা-বাছা কয়েকজনকে রেখে দিচ্ছি আরকী। তুইও আর-একটা বছর ঘষটান দে। ক্লাস থ্রি তোকে ছাড়তে চাইছে না! শুনে বুঝলুম, আমি ফেল মেরেছি। অথচ ফেল মারার কথা নয়। শ্যামাপদস্যারের জন্য কী-না করেছি বল! তার হারানো গোরু খুঁজে এনে দিয়েছি। তার মায়ের জন্য গঙ্গামাটি জোগাড় করে দিয়েছি। তাঁর ফুটো ঘটি গঞ্জ থেকে ঝালাই করে এনেছি।"

বিপদভঞ্জন আড়মোড়া ভেঙে বলল, "জেগে থাকলেই ঝামেলা! ওর চেয়ে পড়ে-পড়ে ঘুমোলে সময়টা বেশ কেটে যায়। খিদের ভাবটাও থাকে না।"

শঙ্কাহরণ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওটা কী ভেসে যাচ্ছে বল তো! মড়া নাকি?"

বিপদভঞ্জন উদাস গলায় বলল, "তা হবে। গরিবেরা তো পয়সার অভাবে দাহ করতে পারে না, অমনই ভাসিয়ে দেয়।"

"তেমন মনে হচ্ছে না। গায়ে জামাকাপড় আছে। চল, তুলি।"

“তুলে কী হবে?”
“বেঁচেও তো থাকতে পারে। জলে পড়ে গেছে হয়তো!”
“দুর দুর, ভাল করতে গিয়ে কোন ফ্যাসাদে পড়তে হয় কে জানে! আমাদের কপাল তো ভাল নয়।”
“আহা, ধর্ম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। গামছাখানা কোমরে বেঁধে নে। দুপুরে স্নানটাও হয়ে যাবে এই তালে।”
বিদ্যাধরী এমনিতে বড় নদী নয়, তবে বর্ষার জল পেয়ে এখন তার বিশাল চেহারা। স্রোতও মন্দ নয়। লোকটা মাঝগাঙ বরাবর বেশ তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল। তবে কিনা শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন দু’জনেই পাকা সাঁতারু। তারা জলে নেমে ভাসন্ত মানুষটার পিছু নিল।
মাইলটাক গেলে বিদ্যাধরীর একটা ঘূর্ণ স্রোত আছে। তাতে পড়লে রক্ষে নেই। শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন প্রাণপণে জল কেটে ঘূণীর আগেই লোকটাকে ধরে ফেলল। তারপর টেনে আনল ডাঙায়। যে জায়গায় তারা লোকটাকে জল থেকে তুলল সে ভারী নির্জন জায়গা। পাশেই শ্মশানঘাট।
লোকটাকে ঘাসের উপর উপুড় করে শুইয়ে দু’জনে খানিক দম নিল।
বিপদভঞ্জন বলল, “এত হাফ ধরছে কেন বল তো? এ নদী তো আমি দিনে চোদ্দবার এপার-ওপার করতে পারি।”
“পেটে দানাপানি না থাকলে দম আসবে কোথা থেকে?”
খানিকক্ষণ জিরিয়ে হাফটা একটু কমলে বিপদভঞ্জন বলল, “বেঁচে আছে কিনা দেখেছিস?”
“মনে হচ্ছে না। খাটুনি বোধ হয় বৃথাই গেল!”
“একটু ডলাইমলাই করে দেখবি নাকি?”
উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার বয়স বেশি না। তিরিশের নীচেই। পরনে বেশ ভাল একখানা প্যান্ট, গায়ে সিল্কের হাফহাতা পাঞ্জাবি। গায়ের রংটা ফরসা, মুখে দাড়ি-গোফ আছে। বেশ লম্বা আর ছিপছিপে।
বিপদভঞ্জন বলল, “দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে রে!”
দুজনে মিলে লোকটার পিঠে কিছুক্ষণ ডলাইমলাই করল। চাপ খেয়ে হঠাৎ লোকটার মুখ দিয়ে ভকভক করে জল বেরোতে লাগল।
বিপদভঞ্জন বলল, “কী মনে হচ্ছে রে?”
“প্রাণের লক্ষণ দেখি না। তবে আর-একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। কপাল ভাল থাকলে বেঁচে যেতেও পারে!”
“হাতে দামি ঘড়ি আছে দেখেছিস?”
“দেখেছি।”
“পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। প্যান্টের বা পকেটে মানিব্যাগও আছে মনে হচ্ছে। যদি না বাঁচে তবে এসব কাকে ফেরত দেব বল তো!”
“তা জানি না। তবে বোধ হয় থানায় জানানোর নিয়ম আছে।”

"ও বাবা, তা হলে আমাদেরই ধরে ফাটকে পুরবে।"

"তাও বটে।"

"তাই তো বলছিলাম, ভেসে যাচ্ছিল, তাই যেত। খামোখা উটকো ঝামেলা ঘাড়ে নিলি!"

"দাঁড়া, দাঁড়া! একটা শ্বাস ফেলার মতো শব্দ হল যেন! গলার কাছটা দ্যাখ তো, শিরা দপদপ করছে কি না?"

বিপদভঞ্জন দেখে বলল, "মনে হল একটু যেন কাঁপছে মাঝেমাঝে। তবে মনের ভুলও হতে পারে। করালীডাক্তারকে একটা খবর দিতে পারলে হত!"

"করালীডাক্তার আসবে কেন? কী দায় পড়েছে?"

দূরে মাঠের মধ্যে একটা লোক ইট দিয়ে গোরুর খোটা পুতছিল। সে এবার এগিয়ে এল। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, কালো, রোগা, মাঝবয়সি একটা লোক। খানিকক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে দাড়িয়ে তাদের কাণ্ডটা দেখে হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলল, "ওরে বাপু, খুনখারাবি করার একটা রীতি আছে তো! এই ভরদুপুরে, লোকালয়ে পাঁচটা লোকের চোখের সামনে ওরকমভাবে মানুষ মারতে হয়?"

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন ভড়কে গিয়ে বলল, "কে বলল খুনখারাবি করছি?"

"আহা, ওসব কি বলতে হয়? কবুল করার মতো আহাম্মক তো আর তোমরা নও! তা কত পেলেটেলে? মোটা দাও মেরেছ তো?"

বিপদভঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, "শুনলি তো শঙ্কু? কী বলেছিলাম? এই তো ফ্যাসাদ বাঁধল!"

শঙ্কাহরণ বলল, "কীসের খুনখারাবি মশাই? জলে ডোবা একটা লোককে রক্ষে করার চেষ্টা করছি।"

"তাই বলো! জলে ডুবিয়ে মেরেছ! তা মেরেই যখন ফেলেছ তখন আর কী করা। তবে কিনা এই চৈতন্যপুর জায়গা কিন্তু খুব খারাপ। লোকে টের পেলে প্রাণ হাতে করে বেরোতে পারবে না।"

শঙ্কাহরণ বিরক্ত হয়ে বলল, "কী মুশকিল! এটা মোটেই খুনখারাবির ব্যাপার নয় মশাই। যান তো, নিজের কাজে যান!"

"যেতে বলছ! তা না হয় গেলাম! কিন্তু বন্দোবস্তটা কীরকম হবে?"

"বন্দোবস্ত! কীসের বন্দোবস্ত মশাই?"

"বুঝলে না! আমার মুখ যদি না খোলাতে চাও, তা হলে একটি হাজার টাকা হাতে গুজে দাও, তারপর যা খুশি করো। এ মুখে একদম কুলুপ এঁটে যাবে।"

"আমাদের মাথায় অত বুদ্ধি নেই মশাই যে, প্যাঁচের কথা বুঝব। আমাদের ট্যাকে মালকড়ি নেই, আমরা হাভাতে লোক।"

"আহা, তোমাদের না থাক, মরা লোকটার পকেটে তো একটা মানিব্যাগ উঁচু হয়ে আছে দেখছি। হাতে দু-দুটো আংটি, গলায় সোনার চেন! তা সব মিলিয়ে দশ-বিশ হাজার মেরেছ ভায়া। হাজার টাকা কি বেশি হল? খুনের কেস বলে কথা!"

শঙ্কা আর বিপদ এতক্ষণ আংটি আর চেন লক্ষ করেনি। এবার করল। বিপদভঞ্জন মুখ শুকনো করে বলল, “কী হবে রে শঙ্কু?”

দুজনের মধ্যে শঙ্কাহরণের একটু সাহসটাহস আছে বুদ্ধিও ছিল এক সময়। ছেলেবেলায় মাথায় অনেক বুদ্ধির ঝিকিমিকি খেলত, ফন্দিফিকির আসত। কিন্তু চর্চার অভাবে এখন মাথাটা কেমন বোদা মেরে গেছে। সারাদিন খিদের চিন্তা করলে মানুষের মগজ পেটে নেমে বসে থাকে। আজ বুদ্ধিটাকে সে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে-করতে নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, “আপনাকে হাজারটা টাকা দেওয়া তেমন শক্ত নয় বটে ! তবে কথা কী জানেন, অন্যের টাকা দান-খয়রাত করাটা তো ন্যায্য কাজ নয়। কেমন কিনা বৃন্দাবনদাদা?"

লোকটা খ্যাক করে উঠল, “বৃন্দাবনদাদা, বৃন্দাবনদাদাটা আবার কে?”

“চৈতন্যপুরের বৃন্দাবনদাদাকে কে না চেনে? প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ আপনি!”

“কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোরো না বাপু বৃন্দাবনটন কেউ এখানে নেই। আমি হলুম কামাখ্যাচরণ দাস। এ গাঁয়ে চোদ্দো পুরুষ ধরে বসবাস। সবাই একডাকে চেনে। তা ও কথাটা কী বললে, অন্যের টাকা না কী যেন! ওরে বাপু, মানুষ পটল তুললে আর তার কিছু থাকে? তার টাকা তখন আর পাঁচজনেই লুটেপুটে খায়।”

শঙ্কাহরণ ভারী কাচুমাচু হয়ে বলল, “পটলতোলা বাবুর কথা হচ্ছে না মশাই হচ্ছে বাটু পরিহারমশাইয়ের কথা। পরিহারমশাই যদি শোনেন যে, তার হক্কের টাকা থেকে আপনাকে ভাগ দিতে হয়েছে, তা হলে কি আমাদের হাড়গোড় আস্ত রাখবেন?”

লোকটা ভড়কে গিয়ে বলল, "পরিহারের কথা উঠছে কেন ?"

"উঠবেই তো! আমরা তার দলেরই লোক কিনা!"

লোকটা একটু হাঁ করে থেকে বলল, "বাটু পরিহারের লোক! সে কথা আগে বলবে তো!"

"গুহ্য কথা পাঁচজনকে বলে বেড়ানো কি ভাল? আপনার চাপাচাপিতে বলে ফেলতে হল!"

"তা বাপু, পরিহারমশাইকে আমার নমস্কার জানিয়ো। যা করছ করো, কেউ কিছু বলবে না।"

লোকটা তাড়াতাড়ি হাটা দিয়ে কয়েক পা গিয়ে ফের ফিরে এল। ভারী অমায়িক গলায় বলল, "বুঝলে বাপু, বুড়ো হয়েছি তো, ভীমরতিই হবে! এখন মনে পড়েছে, আমার নামটা বৃন্দাবন ঘোষই বটে! দিদিমা রেখেছিলেন। বুঝলে তো! ওই বৃন্দাবন ঘোষই থাকুক, কেমন?"

"যে আজ্ঞে। যা বলবেন!"

কামাখ্যা বা বৃন্দাবন হনহন করে হেঁটে লহমায় মাঠ পার হয়ে গেলে বিপদভঞ্জন বলল, "বাটু পরিহারটা আবার কে রে?"

"সে আছে। সব জায়গাতেই একটা করে মানুষ-মুষল থাকে। ছিনতাই করে, খুনখারাবি করে, তোলা নেয়, মাথা ফাটায়, ঠ্যাং ভাঙে। এ তল্লাটের মুষল হল বাটু পরিহার। আমাদের আঘোরগঞ্জে যেমন গোপাল গুচ্ছাইত। শীতলাবাজারে তেমন ল্যাংড়া সানাই, আবার রাধিকাপুরে হল ন্যাড়া শিবু!"

বিপদভঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ওরকম একটা কিছু হতে পারলেও বেশ হত!"

"মাংসের মশলা কি আর সুক্তোয় খাটে! আমরা ওরকম হতে গেলে হিতে বিপরীত হবে!"

"এখন এ লোকটাকে নিয়ে কী করা?"

"দেখা যাক আর-একটু চেষ্টা করে। জ্ঞান না ফিরলে জলেই ফেলে দিতে হবে।"

আরও আধঘণ্টা যত রকম প্রক্রিয়া জানা ছিল সবই কাজে লাগাল তারা। খুব ধীরে-ধীরে অবশেষে শ্বাস পড়তে শুরু করল, নাড়ি ক্ষীণ হলেও চালু হল, বুকে ধুকপুকুনি হতে লাগল। এবং আরও খানিকক্ষণ পরে শেষে লোকটা চোখও মেলল। তবে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, ফ্যালফ্যালে চাউনি।

বিপদভঞ্জন বুকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে এখন?"

লোকটা জবাব দিতে পারল না বটে, তবে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

শঙ্কাহরণ মস্ত শ্বাস ফেলে বলল, "যাক, বেঁচে আছে!"

"তা তো হল, কিন্তু একে নিয়ে এখন করবি কী? অঘোরগঞ্জ পর্যন্ত যদি নিয়ে যেতেও পারি তবে থাকবে কোথায়? আমাদের কুঁড়েঘরে কোনওক্রমে রাখতে পারি বটে, কিন্তু খাওয়াব কী? আমাদেরই পেট-ভাতের জোগাড় নেই!"

শঙ্কাহরণ ওরফে শঙ্কা বলল, "অত আগবাড়িয়ে ভাবছিস কেন? লোকটার চেহারা দেখছিস না, আমাদের মতো এলেবেলে লোক নয়। গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে গাঁয়ের লোকই ব্যবস্থা করবে। একটু সুস্থ হলে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। বড়জোর একটা রাত।"

"তা অবিশ্যি ঠিক ও মশাই, উঠে বসতে পারবেন? এখানে পড়ে থাকলে তো চলবে না !"

লোকটা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না। তবে দৃষ্টিতে যেন একটু নজর এল। তাদের দিকে চেয়ে দেখল একটু। খুব দুর্বলভাবে যেন উঠে বসবারও চেষ্টা করল। দু'জনে দুধার থেকে সাবধানে ধরে বসাল তাকে। লোকটা বসে রইল, পড়ে গেল না।

"দাঁড়াতে চেষ্টা করুন তো! চেষ্টা করলে পারবেন।"

দু-তিনবারে হল না বটে, কিন্তু চতুর্থবারের চেষ্টায় লোকটা উঠে দাঁড়াল। এবং একটু পরে দুর্বল পায়ে একটু হাঁটতে শুরু করল।

বিপদভঞ্জন বলল, "এই তো পেরেছেন। এই মাঠটুকু পেরোলেই গোরুরগাড়ি পেয়ে যাব।"

লোকটা এ পর্যন্ত একটাও কথা কয়নি। এখনও কোনও জবাব দিল না।

"ও শঙ্কু, কথা কইছে না কেন রে?"

"মাথাটা এখনও ভাল কাজ করছে না। বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে যেন কী সব গণ্ডগোল হয় মগজে।"

"কোথায় নিয়ে তুলবি বল তো?"

"যেতে-যেতে ভাবব।"

"করালীডাক্তারের কাছে নিয়ে হাজির করলে হয় না? লোকটা বিটকেল বটে, কিন্তু মনটা ভাল!"

"যদি তাড়া করে?"

"কাউকে-কাউকে তাড়া করে বটে, কিন্তু তোকে বা আমাকে তো করেনি? বরং বাগানের জঙ্গল সাফ করতে, পুকুরের পানা তুলতে বা সুপুরি আর নারকোল পাড়তে আমাদেরই তো ডেকে পাঠায়?" "কিন্তু নতুন লোক দেখলে বিগড়ে যেতে পারে। তবে বলছিস যখন করালীডাক্তারের কাছেই চল। পসার নেই বটে, তবু ডাক্তার তো! ওষুধপত্র দিয়ে মানুষটাকে তাড়াতাড়ি চাঙা করে তুলতে পারে।"

॥ দুই ॥

জ্যোতিষী হিসেবে জটেশ্বর ঘোষালের খুবই নামডাক। গণনা করে যা বলেনটলেন একেবারে অব্যর্থ। ফলবেই কি ফলবে। তবে তার মধ্যেও একটু কথা আছে। ফলে বটে, তবে উলটো রকমে। এই ছেলে ফটিক এসে বলল, “জ্যাঠামশাই, হাতটা একটু দেখে দেবেন? রেজাল্টের জন্য বড় ভয় হচ্ছে।”

অনেক হিসেবনিকেশ করলেন, তারপর ভ্রু কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “না রে, এবারটায় হবে না।”

শুনে ফটিক লাফিয়ে উঠে দু' পাক তুর্কি নাচ নেচে, “মেরে দিয়েছি! মেরে দিয়েছি!” বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে বেরিয়ে গেল। এবং রেজাল্ট বেরোবার পর বাস্তবিকই দেখা গেল, ফটিক বেশ ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে।

নবারুণ

ক্লাবের ফুটবল ক্যাপ্টেন গত দু' বছর ধরে আন্তঃজেলা ফুটবলের শিল্ড জিততে না পারায় একদিন জটেশ্বরের কাছে এল। বলল, "কাকামশাই, এবারও কি শিল্ডটা আমাদের ভাগ্যে নেই?"

জটেশ্বর ফের গণনায় বসলেন। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ক্লাবের জন্মমুহূর্ত থেকে একটা ঠিকুজিও করে ফেললেন। এবং বললেন, "উহু, শিল্ড এবারও তোদের কপালে নেই!"

সেই খবর শুনে ক্লাবে সে কী উল্লাস! হিপহিপ হুররে, জিন্দাবাদ ইত্যাদি ধ্বনির সঙ্গে রসগোল্লা বিতরণও হয়ে গেল। শেষ অবধি নবারুণ ক্লাব শিল্ডও জিতেছিল।

গণেশবাবুর সেবার যায়-যায় অবস্থা। ডাক্তার ভরসা দিচ্ছে না। উইলটুইল করে ফেলেছেন। একদিন জটেশ্বরকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "বাপু জটেশ্বর, কোষ্ঠীটা একটু ভাল করে দ্যাখো তো! মৃত্যুযোগটা কি এগিয়ে এল?"

জটেশ্বর কোষ্ঠী নিয়ে বসে গেলেন। বিস্তর ক্যালকুলেশনের পর মাথা নেড়ে বললেন, "না গণেশখুড়ো, মৃত্যুযোগ তো দেখছি না!"

শুনে গণেশবাবুর মুখ শুকনো। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। গণেশবাবু ক্ষীণ গলায় বললেন, "একটু ভাল করে দ্যাখো হে! অনেক সময় রিস্টিগুলো ঘাপটি মেরে থাকে। খুঁজে দ্যাখো, লুকোছাপা করে কোনও কোনায় ঘুপচিতে গা-ঢাকা দিয়ে আছে কি না। ডাক্তার যে জবাব দিয়ে গিয়েছে!"

জটেশ্বর ফের হিসেব নিয়ে বসলেন এবং ঘণ্টাখানেক গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে বললেন, "হ্যাঁ খুড়ো, একটা মঙ্গল আর রাহুর অবস্থানের যোগ পাচ্ছি বটে। তা হলে তো সামনের পূর্ণিমাতেই..."

গণেশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বাড়িতেও ভারী আনন্দের লহর বয়ে গেল। এবং গণেশবাবু আজ সকালেও অভ্যাসমতো চার মাইল প্রাতভ্রমণ করেছেন।

আর এই জন্যই জটেশ্বরের নামডাক। অন্য জ্যোতিষীরা দশটা ভবিষ্যদ্বাণী করলে দু-চারটে মিলে যায়। কিন্তু জটেশ্বরের দশটার মধ্যে দশটাই ভুল হয়। এই জন্যই শুভ কাজের আগে জটেশ্বরের কাছে গিয়ে লোকে হাত বা কোষ্ঠী দেখিয়ে নেয়।

যদিও জটেশ্বরকে দেখলেই করালীডাক্তার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, তবু প্রতিদিনই বিকেলের দিকটায় জটেশ্বরের একবার করালীডাক্তারের বাড়ি এক কাপ চা খাওয়া চাই-ই। কারণ, করালীর বাড়ির চা অতি বিখ্যাত। যেমন সুগন্ধ, তেমনই স্বাদটা অনেকক্ষণ জিভে লেগে থাকে।

আজ করালীডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেই করালী হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি তো একটা খুনি! তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত।"

জটেশ্বর বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে বললেন, "আহা, সে হবে'খন। অত তাড়াহুড়ো কীসের? আমার গলাও আছে, ফাঁসির দড়িও পালিয়ে যাচ্ছে না। বলি, হয়েছেটা কী?"

"কী হয়নি? আমার রুগি গোপীবল্লভবাবুকে যে তুমি খুন করেছ, সেটা কি জানো?"

"খুন হয়েছেন বুঝি! যাক, কানাঘুষো শুনছিলাম বটে! এই তোমার কাছে পাক্কা খবর পেলাম।"

"কানাঘুষো শুনছিলে! কীসের কানাঘুষো?"

“ওই যা সব সময় শোনা যায় আরকী! লোকে ফিসফাস করছে, করালীডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় গোপীবাবুর প্রাণটা বেঘোরে গেল!”

করালী মারমুখো হয়ে আস্তিন গুটিয়ে তেড়েফুড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আস্তিন গুটোতে গিয়ে দ্যাখেন, তার গায়ে জামা নেই, শুধু একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। আর স্যান্ডো গেঞ্জির আস্তিন গুটনো যে ভারী শক্ত কাজ এ কে না জানে। তিনি দাঁত কড়মড় করে বললেন, “যারা ওকথা বলে তাদের জিভ টেনে ছিড়ে নিতে হয়। তাদের নাম বলো, আমি তাদের ব্যবস্থা করছি।”

জটেশ্বর আদুরে গলায় বললেন, “তুমি যে গুন্ডা প্রকৃতির লোক একথা সবাই জানে। এখন আসল কথাটা ভেঙে বলে তো !”

“তুমি পরশুদিন গিয়ে গোপীবাবুকে বলে আসোনি যে, নরহরি চাকলাদারের সঙ্গে তার যে পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে তাতে তিনি নির্ঘাত জিতবেন। বলোনি?”

জটেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, “বলেছি বইকী? গুনে দেখলুম, একেবারে জলবৎতরলং ব্যাপার। মামলায় জিত কেউ আটকাতে পারবে না।”

“তুমি কি জানো যে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী শুনেই উনি রাতে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান?”

“কেন, মামলায় কি গোপীবাবুর জেতার ইচ্ছে ছিল না?”

“খুব ছিল। কিন্তু তোমার ফোরকাস্ট শুনেই উনি বুঝলেন যে, জেতার কোনও আশাই নেই। আর তাই টেনশনে হার্ট অ্যাটাক!”

অতি উচ্চাঙ্গের একটি হাসি হেসে জটেশ্বর বললেন, “তা হলে কি বলতে চাও লোকে আমাকে উলটো বোঝে?”

“না, লোকে তোমাকে ঠিকই বোঝে। আর তাই উলটো করে ধরে নেয়। তুমি কি জানো যে, তুমি একজন ধাপ্পাবাজ? তুমি না জানলেও ক্ষতি নেই। লোকে জানে।”

জটেশ্বরের বিচলিত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মুখে ভারী মিষ্টি একটু হাসি। মিষ্টি করে বললেন, “মুখে যাই বলো করালী, মনে-মনে যে তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো তা আমি জানি।”

করালীবাবু হাঁ হয়ে গেলেন। তারপর স্তম্ভিত গলায় বললেন, “শ্রদ্ধা ! তোমাকে!”

জটেশ্বর মৃদু-মৃদু হেসে বললেন, “তুমি দুর্মুখ বটে, ডাক্তার হিসেবেও অচল, তবে লোকটা তো আর খারাপ নও। সেই কুড়ি বছর আগে যখন তুমি এখানে এসে থানাগেড়ে বসলে, তখনই তোমাকে বলেছিলুম কিনা, ওহে করালী, প্রথমটায় তোমার খুব পসার হবে ঠিকই। তবে রাখতে পারবে না! কথাটা ফলল কিনা দেখলে তো?”

“ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পেলে না? তোমাকে আমি কস্মিনকালেও হাত দেখাইনি, কোষ্ঠীবিচারও তোমাকে দিয়ে করাইনি। তোমার আগড়মবাগড়ম

কথাকে পাত্তাও দিইনি। আর পসার কমেছে তোমাকে কে বলল? এখনও মরণাপন্ন রুগির জন্য সবাই আমার কাছে এসেই ধরনা দেয়।”

“আহা, চটো কেন ভায়া! আমিও তো সর্দিকাশি বা জ্বরজাড়ি হলে অনিচ্ছে সত্ত্বেও ক্ষমাঘেন্না করে তোমার ওষুধ বার কয়েক খেয়েছি। তাতে কাজ না হলেও বন্ধুকৃত্য বলেও তো একটা কথা আছে নাকি! কিন্তু সেই যে বনবিহারী ঘোষের সান্নিপাতিকের সময় তুমি তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে চোবালে, তারপর পুকুর থেকে তুলে গায়ে ফুটন্ত গরম জল ঢাললে, ফের পুকুরে ডোবালে, ফের তুলে গরম জল ঢাললে— ও কাজটা তোমার মোটেই ঠিক হয়নি।”

“তার তুমি কী বুঝবে? বনবিহারীর টাইফয়েড এমন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বাঁচার কথাই নয়। ওই অল্টারনেটিভ বাথ দেওয়ায় প্রাণে বেঁচে যায়। বনবিহারী রাজি হচ্ছিল না বলে তাকে প্রাণে বাঁচাতে একটু জুলুম করতে হয়েছিল, এই যা!”

“তা বটে। তবে প্রাণে বাঁচলেও বনবিহারী সেই থেকে তোমার মুখদর্শন করা বন্ধ করেছে তা জানো? তারপর ধরো, খগেন হাওলাদার। সে ঘড়ি ধরে ওষুধ খায়নি বলে তুমি তার গলা টিপে ধরেছিলে। খগেনের জিভ বেরিয়ে যায়। আর-একটু হলেই তুমি খুনের দায়ে পড়তে!”

“খগেন অতি বজ্জাত। হাই শুগার হওয়া সত্ত্বেও সে লুকিয়ে রসগোল্লা খেত। গলা টিপে ধরায় সে ভয় খেয়ে মিষ্টি ছেড়েছে। তাতে তার মঙ্গলই হয়েছে।”

“তা হয়তো হয়েছে। কিন্তু খগেন যে তোমার নামে পুলিশে রিপোর্ট করেছিল তাও তো আর মিথ্যে নয়। তারপর ধরো উপেন দাস। তার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য তুমি তাকে গ্রিসারিন সাপোজিটারি দিয়েছিলে। দোষের মধ্যে সে জিজ্ঞেস করেছিল দিনে কটা করে খেতে হবে। তাতে খাপ্পা হয়ে তুমি তাকে এমন তাড়া করেছিলে যে, সে ছুটে গিয়ে বিদ্যাধরীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কাজটা কি উচিত হয়েছিল হে করালী? লোকে কি আর সাধে বলে ‘করালডাক্তার’!”

“ডাক্তারের কাজ হল ছলে-বলে-কৌশলে রোগীর প্রাণরক্ষা করা। শুধু নিদান লিখে দিয়ে পকেটে পয়সাটি পুরলেই ডাক্তারি হয় না! রোগী ওষুধ ঠিকমতো খেল কি না, পথ্যিতে গণ্ডগোল করল কি না সেটা দেখাও ডাক্তারের কর্তব্য। লোকে আমাকে অপছন্দ করতে পারে, কিন্তু কেউ কখনও বলতে পারবে না যে, করালীডাক্তার পয়সা নিয়ে মিথ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়েছে বা স্যাম্পেল ওষুধ বাজারে বিক্রি করেছে।”

“তুমি ভাল লোক হলেও হতে পার, কিন্তু ভদ্রলোক মোটেই নও। ভদ্রলোক কি কখনও গুন্ডামি করে বেড়ায়, নাকি লোকের উপর হামলা করে? আচ্ছা, নবকিশোরের দোষটা কী ছিল বলো? তোমার চেম্বারে বসে সে বিনোদডাক্তারকে প্রশংসা করছিল, তাতে দোষটা কী? সে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, ‘দেশটা তো জালি ডাক্তারে ভরে গিয়েছে, তার মধ্যে বিনোদডাক্তার যেন বাতিঘর।’ কিন্তু মিছে কথাও বলেনি। বিনোদ অতি সজ্জন, অমায়িক, ডাক্তারও ভাল। আর তুমি কী

করলে? এই কথা শুনে খেপে গিয়ে নবর গলার চাদর ধরে মুচড়ে কী বাকুনিটাই দিচ্ছিলে! ঘাড় মটকে মরেই যেত। অন্য লোকেরা এসে তোমার হাতে-পায়ে ধরে তাকে বাঁচায়।”

“ও তুমি বুঝবে না। নব ইচ্ছে করেই ওসব বলছিল। অতি উচ্চাঙ্গের বদমাশ।”

এই সময়ে করালীডাক্তারের স্ত্রী সুরবালা দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, “আচ্ছা, দুটো লোক এক নাগাড়ে বিশ বছর ধরে কী করে ঝগড়া করতে পারে তা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন? ঝগড়ার বহর দেখে তো আমি রোজ ভাবি, এবার বোধ হয় দু'জনে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল! ওমা, কোথায় কী, পরদিনই দেখি দুজনে আবার কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে বসে গিয়েছে! এত ঝগড়া, তবু দেখি দু'জনে দু'জনকে একদিনও না দেখে থাকতে পারেন না?”

করালীডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, “হুঁ, ওরকম একটা ধাপ্পাবাজ দু' নম্বরি লোকের মুখ দেখলেও পাপ হয়। হায়া-লজ্জা নেই কিনা, তাই বিনা পয়সায় চা খেতে আসে।”

সুরবালা রাগ করে বললেন, “ছিঃ, ওকথা বলতে আছে? ঠাকুরপো জ্যোতিষী করেন বটে, কিন্তু কারও কাছ থেকে পয়সা নেন না। আর চায়ের খোটা দিচ্ছ? ঠাকুরপোর বাড়িতে ভাল পদ রান্না হলে, পিঠে-পায়েস হলে যে বাটি ভর্তি করে নিজে বয়ে এসে দিয়ে যান, সেটা বুঝি কিছু নয়?”

করালী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একটু তাচ্ছিল্যের হুঁ, দিয়ে চুপ করে গেলেন।

সুরবালা বললেন, “আপনি কিছু মনে করবেন না ঠাকুরপো!”

মৃদু হেসে অতি মোলায়েম গলায় জটেশ্বর বললেন, “অন্য রকম হলেই মনে করতুম বউঠান। বাঘের গায়ে যদি বেটকা গন্ধ না থাকে, ষাঁড় যদি লাল রং দেখে তেড়ে না আসে, গরিলা যদি নিজের বুকে থাবড়া না মারে, তা হলেই চিন্তার কথা। তেমনই করালী যদি হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে করালী বলে চেনা যাবে কি?”

সুরবালা হেসে চলে গেলেন।

করালীডাক্তার দাঁত কড়মড় করে বললেন,“আমার বাড়ির লোকের আশকারা পেয়েই তোমার আস্পদা দিনে-দিনে বাড়ছে।”

জটেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা আরামের শব্দ করলেন, “আঃ!” ঠিক এই সময় ফটকের ওপাশে রাস্তায় একটা গোরুরগাড়ি এসে থামল। দুজন মুনিশগোছের লোক একজন প্যান্ট আর পাঞ্জাবি পরা লোককে ধরে-ধরে গাড়ি থেকে নামাল।

চায়ের কাপ শেষ করে জটেশ্বর চুকচুক শব্দ করে বললেন, “আহা রে, কার এমন ভীমরতি হল যে, তোমার কাছে চিকিচ্ছে করাতে আনছে! উহু, এ গাঁয়ের লোক নয়। এ গাঁয়ের লোক হলে এমন দুর্মতি হত না!”

যার উদ্দেশে বলা সেই করালীডাক্তার কিন্তু কথাটা শুনতে পেলেন না। তিনি দূর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে মাঝখানের লোকটাকে নিরীক্ষণ করতে-করতে আপন

মনে স্বগতোক্তির মতো বললেন, “জলেডোবা কেস। মেমোরি লস, হেমারেজ।”

চায়ের কাপটা রেখে জটেশ্বর বললেন, “বাঃ, দূর থেকেই যখন ডায়াগনোসিস করে ফেললে তখন নিদানটাও হেঁকে বলে দাও। রোগীকে আর নেড়েঘেঁটে দেখার দরকার কী? ফটক থেকেই বিদেয় হয়ে যাক।”

করালীডাক্তার কথাটায় কান দিলেন না। উঠে পড়তে-পড়তে বললেন, “না হে, দেখতে হচ্ছে।”

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন লোকটাকে বারান্দায় এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে করালীকে বলল,“বিদ্যেধরী থেকে তুলেছি আজ্ঞে, আপনার কাছেই নিয়ে এনে ফেললাম!”

“বেশ করেছ। কেন, আমার বাড়িটা কি ধর্মশালা, না লঙ্গরখানা?”

দু’জনেই মিইয়ে গেল খুব। শঙ্কাহরণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল,“বড়ঘরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, তাই ভাবলুম আমাদের কুঁড়েঘরে তো তোলা যায় না, আর খাওয়াবই বা কী? আমাদেরই জোটে না, তাই!”

চেয়ারে বসেই লোকটার ঘাড় লটকে গেছে, চোখ বোজা। করালীডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন, “ও পাশে রুগির ঘরে নিয়ে বেড়ে শুইয়ে দে। আধমরা করে তো এনেছিস !”

জটেশ্বরও বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে দেখলেন। তারপর বললেন, “এ তো বড়ঘরের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে হে। হাতে দামি ঘড়ি, আঙুলে হিরের আংটি!”

ভাগ্যিস এগুলো বলতে তোমার জ্যোতিষ বিদ্যে লাগে না। কিন্তু ঘড়ি আর আংটি ছাড়াও লক্ষ করার আরও বিষয় আছে, বুঝলে। সিল্কের জামাটার একটা ফুটো দেখতে পাচ্ছ? ওটা বোধ হয় বুলেট ইনজুরি।”

তারপর করালী শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জনকে বললেন, “জামা, গেঞ্জি খুলে শোওয়াবি।”

দু’জনে তাড়াতাড়ি লোকটাকে চ্যাংদোলা করে বারান্দার লাগোয়া সিক রুমে নিয়ে গেল।

করালীডাক্তার গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে পরীক্ষাকরলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে করালীডাক্তারের পরীক্ষানিরীক্ষা দেখার পর পাশ থেকে জটেশ্বর প্রশ্ন করলেন,“কেমন বুঝছ?”

“বেঁচে যাবে। তবে সময় লাগবে।”

“মেমরি লস বুঝলে কীভাবে?”

“চোখ দেখে। লুকটা খুব ভ্যাকান্ট।”

|| তিন ||

তল্লাটের সবাই জানে যে, প্রেতসিদ্ধ বগলাপতির দুটো দেহাতি ভূত আছে। একজনের নাম গানা, আর-একজনের নাম বাজানা। সবাই এও জানে যে, ভূতদুটো একটু বাউণ্ডুলে স্বভাবের। তারা খুবই বেড়াতে ভালবাসে এবং মাঝে-মাঝেই তারা বগলাপতিকে না জানিয়েই হাওয়া হয়ে যায়। আর বগলাপতি তখন বিদ্যেধরী নদীর ধারের সাধনপীঠ ছেড়ে টর্চ হাতে তাদের খুঁজতে বেরোন।

লালমোহনবাবু বগলাপতিকে টর্চ হাতে ভূত খুঁজতে দেখে খুব ভালমানুষের মতো বললেন, "আচ্ছা বগলাদা, ভূত খুঁজতে টর্চ লাগে কীসে? আমি তো টর্চ ছাড়াই অন্ধকারে দিব্যি ভূত দেখতে পাই।"

বগলাপতি অবাক হয়ে বললেন, "তুমি ভূত দ্যাখো নাকি?"

"প্রায়ই দেখি। ষষ্ঠীতলায় এই তো সেদিন মুকুন্দকে দেখলুম, বসে-বসে কী যেন ভাবছে। পিরবাবার থানের পাশে কদমগাছের নীচে নিশাপতি আর তার বউ লতাকে দেখি, হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীলকুঠির মাঠে তো প্রায়ই যোগেন পালোয়ানকে দেখা যায়।"

"কই, কখনও বলোনি তো!"

"আমি তো ভাবি, আমার মতো অন্য সবাইও দেখতে পায়। আমাদের মতো ওরাও গাঁয়ে থাকে, এ তো আর নতুন কথা কিছু নয়। কিন্তু কথা হল, অন্ধকারেই তাদের বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, টর্চের দরকার হয় না।"

"টচটা ভূতের জন্য নয় হে, সাপখোপের জন্য। তা তুমি সত্যিই ভূত দেখতে পাও, না অন্য সবার মতো ইয়ার্কি মারছ!"

লালমোহন ভড়কে গিয়ে বললেন,"ইয়ার্কি!"

"না, তুমি অবশ্য সেরকম মানুষ নও। তা তোমার ভূতগুলোকে একবার দেখাতে পারবে?"

লালমোহন তাড়াতাড়ি বললেন,"তারা আমার ভুত হতে যাবে কেন? তারা গাঁয়ের ভূত, সকলের ভূত। দেখা শক্ত কিছু নয়, সময়মতো ঠিক জায়গায় গেলেই দিব্যি দেখতে পাবেন।"

"না, না, আমার একা যাওয়াটা ঠিক হবে না। তারা হয়তো আমাকে দেখে ভড়কে যাবে। ভাববে, গানা-বাজানার মতো আমি তাদেরও ধরে মস্তর দিয়ে আটকে রাখব।"

"তা অবিশ্যি ঠিক। আপনাকে জ্যান্ত মানুষই ভয় খায়, ভূতেদের তো কথাই নেই। ঠিক আছে, আমিই নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব'খন আড়াল থেকে।"

"দিয়ো। আর ইয়ে, কথাটা আবার পাঁচকান কোরো না যেন!"

"আজ্ঞে না। সবাই তো জানে আমি বোকা, তাই কাউকে কিছু বলে লাভ হয় না মশাই। কেউ আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নেয় না।"

“বোকা হতে যাবে কেন! তুমি হলে সোজা-সরল মানুষ। গাঁয়ের লোকের স্বভাবই হল ধলোকে কালো দেখা। এই আমাকেও তো কত লোক ভণ্ড, জালি, জোচ্চোর বলে, ওসব কি আমি গায়ে মাখি? ওসব নিয়ে তুমি মন খারাপ কোরো না!”

লালমোহন একগাল হেসে বললেন, “মন খারাপ হবে কোন দুঃখে? আমি যে সত্যিই ভারী বোকা। আর বোকা হয়ে সুখ আছে মশাই।”

“তাই নাকি? কীরকম?”

"দোষঘাট করে ফেললেও লোকে ক্ষমাঘেন্না করে দেয় কিনা!"

"বটে!"

"এই তো সেদিন বনবিহারীবাবুর আড্ডায় পেটের চর্বি নিয়ে কথা হচ্ছিল। শেষে সাব্যস্ত হল, পেটে চর্বি হওয়া মোটেই ভাল নয়। ওতে শরীর ভারী দুর্বল হয়ে পড়ে। তা কথাটা সেই থেকে আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। গত বেম্পতিবার মগনের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, গোপাল গুচ্ছাইত তার দলবল নিয়ে বসে চা খাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, গোপালের যেন বেশ একটু ভুড়ি হয়েছে!

তখন ভাবলাম, ষণ্ডাগুন্ডাদের পেটে চর্বি হলে তো সর্বনাশ। শরীর দুর্বল হলে গুন্ডামি করবে কীসের জোরে? গোপালের সত্যিই ভুড়ি হয়েছে, নাকি লুঙ্গির গিট উঁচু হয়ে আছে সেটা পরখ করার জন্য কাছে গিয়ে ভুড়িটায় একটা খাবলা দিলাম। কে জানত মশাই যে, গোপালের অমন কাতুকুতু আছে! খাবলা দিতেই বাপ রে' বলে চায়ের গেলাস উলটে গাঁক-গাঁক করে চেঁচাতে লাগল। তার দলের লোকেরা এসে আমাকে চেপে ধরতেই আমি চিঁচিঁ করে বললাম, 'গোপালবাবুর পেটে চর্বি হয়েছে কি না দেখছিলাম!' গোপাল গুচ্ছাইত কিন্তু রাগ করল না। সবাইকে বলল, লালুবাবু বোকাসোকা লোক, সবাই জানে। ছেড়ে দে, মারধর করিস না। আসুন লালুবাবু, চা খান। পেটে চর্বির কথা বলে ভাল করেছেন। আবার ব্যায়াম শুরু করতে হবে। আমার সত্যিই পেটে একটু চর্বি হয়েছে!' "

"তোমার সাহস আছে হে লালমোহন। গোপাল গুন্ডাকে কাতুকুতু দেওয়া যার-তার কর্ম নয়!"

"পশুপতি টাটের বাড়িতে সেদিন সন্ধেবেলায় বসে আছি, হঠাৎ চারটে মুশকো চেহারার লোক হাতে রড, ভোজালি, পাইপগান নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, যা আছে চটপট দিয়ে দিন। আমরা ডাকাতি করতে এসেছি। হাতে একদম সময় নেই। আরও চার বাড়ি যেতে হবে। জলদি করুন।' ডাকাত দেখে পশুপতিবাবু আঁ-আঁ করে উঠলেন বটে, কিন্তু আমার বেশ আহ্লাদ হল। জীবনে কখনও ডাকাতি দেখিনি কিনা!"

"দেখলে নাকি?"

"আজ্ঞে, দেখলুম বৈকি! ডাকাতদের পিছুপিছু ঘুরে-ঘুরে দিব্যি দেখলুম। দু' চোখ সার্থক। ডাকাতরা একটা পার্কার পেন ফেলে যাচ্ছিল, সেটা ধরিয়ে দিলুম, একটা লক্ষ্মীর ঘটও দেখিয়ে দিলুম। শেষে যাওয়ার সময় কার হাত থেকে যেন দুটো কাঁচা টাকা পড়ে গিয়েছিল। কুড়িয়ে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সর্দারের হাতে দিয়ে দিলুম। তাতে পশুপতিবাবুর কী রাগ আমার উপর। এই মারেন কি সেই মারেন। ঘরশত্রু বিভীষণ, ডাকাতদের চর, মিটমিটে ভাম, কত কী বললেন। শেষমেশ পাড়ার লোক এসে তাকে ঠান্ডা করে বোঝাল যে, লালুবাবু যে বোকা তা কে না জানে বলুন ! বোকা লোকেরা অন্য রকম হলেই ভয়ের কথা! তবু পশুপতির টাটের রাগ কমে না। কেবল বলছিলেন, সবই তো গেল, দুটো টাকা পড়ে গিয়েছিল, সেটা না হয় ঘর বলতে থাকত, তাও ওই আহাম্মকের জন্য গেল!' "

"না, না, মাত্র দুটো টাকার জন্য পশুপতির ওরকম করা উচিত হয়নি!"

"হ্যাঁ। পরে অবশ্য ঠান্ডা হয়ে তিনি চা-ও খাইয়েছেন। তাই বলছিলুম, বোকা হওয়ার কিছু সুবিধেও আছে মশাই!"

"তাই দেখছি। তা এসো, আমার সাধনপীঠে একটু বসে যাও। এক ভক্ত একছড়া কলা দিয়ে গেছে। দুটো কলা খেয়ে দেখবে চলো।"

বগলাপতির সাধনপীঠ বেশ নিরিবিলি জায়গা। সামনেই বিদ্যেধরীর ঘাট। গোটা কয়েক বটগাছ আছে, কাছেই শ্মশান, বগলাপতির একখানা কুটির আছে, আঙিনায় একখানা পাথর বাঁধানো বেদি।

এত রাতে বগলাপতির ভক্তরা কেউ থাকে না। কিন্তু ধুনির আলোয় দেখা গেল বেদির সামনে ধুতি আর শার্ট পরা একজন লোক বসে আছে। তাকে দেখে বগলাপতি ভারী খুশি হয়ে বললেন, "কামাখ্যা নাকি রে? বহুদিন পর দেখা! তা এত রাতে কী মনে করে?"

সিড়িঙ্গে চেহারার হাড়গিলে লোকটা কাঁচুমাচু মুখ করে বিরস গলায় বলল, "কামাখ্যা নই মশাই, আমার নাম বৃন্দাবন।"

বগলাপতি খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "বৃন্দাবন!! বৃন্দাবনটা আবার কে? স্পষ্ট দেখছি সামনে কামাখ্যা বসে আছে, আর বলছিস, তুই বৃন্দাবন? আমার চোখে চালসেও ধরেনি, ভীমরতিও হয়নি।"

"আজ্ঞে, আমি নির্যাস বৃন্দাবনই বটে। আপনার ভুল হচ্ছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বগলাপতি বেদির উপর পাতা কুটকুটে কম্বলের আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বললেন, "কামাখ্যা হল নীলপর্বতে, প্রাগজ্যোতিষপুরের কাছে। আর বৃন্দাবন হল সেই উত্তরাখণ্ডে, হস্তিনাপুর না কী যেন জায়গাটা, তার কাছে তা কামাখ্যা ছেড়ে তুই বৃন্দাবনগামী হলি কবে?"

জামার তলায় কোমরে প্যাঁচানো গামছাখানা খুলে এনে লোকটা মুখ মুছে বলল, "কারণ আছে। আমার বড় বিপদ, আমি হলুম চর হেতমপুরের বৃন্দাবন ঘোষ।"

"দ্যাখ কামাখ্যা, তুই যদি বৃন্দাবন হোস, তবে আমিও গাঁধীজি। যদি ভেবে থাকিস যে বুড়ো বয়সে আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, তা হলে ভুল করবি। কারণ, আমি বুড়ো হইনি। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বুড়ো হওয়া শক্ত।"

পাশ থেকে লালমোহনবাবু অত্যন্ত উদ্বেগের গলায় বলে উঠলেন, "গেল হপ্তায় যে বললেন ছাপ্পান্ন!"

"বলেছি নাকি? ওরে বাপু, আত্মার বয়সও হয় না, সে বুড়োও হয় না, মরে না, জন্মায় না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।' মানে জানো? ওর মানে হচ্ছে আত্মা অজর অমর। তার আটচল্লিশই বা কী আর ছাপ্পান্নই বা কী?"

লালমোহনবাবু ভারী অবাক হয়ে বললেন, "তা হলে এই লোকটার বৃন্দাবন হতে আটকাচ্ছে কীসে? আত্মার বৃন্দাবনই বা কী, কামাখ্যাই বা কী!"

"আটকায় হে আটকায়, আইনে আটকায়!"

হাড়গিলে লোকটা বলল, আমি কামাখ্যা না হয়ে বৃন্দাবন হলে কার কী ক্ষতি হচ্ছে বলুন তো! দুনিয়া তো আর উলটে যাচ্ছে না, চন্দ্র-সূর্যও উলটো বাগে উঠবে না।"

বগলাপতি নিমীলিত চোখে চেয়ে বললেন, "অত বড়-বড় কাণ্ড না হলেও ছোটখাটো ফ্যাকড়া তো বাধতে পারে। তা হ্যাঁ রে কামাখ্যা, চুরি-ডাকাতি করে

ফেরার হয়েছিস, নাকি খুনখারাবি করে এসেছিস ?”

কামাখ্যা ওরফে বৃন্দাবন অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, “খুনটা আমি করতে যাব কেন! করল তো বাটু পরিহারের লোক!”

বগলাপতি একটা শ্বাস ফেলে বললেন, “তাই বল। তা হলে খুন একটা হয়েছে!”

লোকটা কিছুক্ষণ গুম মেরে মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, “আমার যে বড় বিপদ বগলাদাদা !”

“খোলসা হ’ কামাখ্যা, খোলসা হ’। কথা যত চেপে রাখবি তত মুশকিলে পড়বি। খুনটা হল কে?”

“আজ্ঞে, তা জানি না। ফরসামতো একটা লোক, লম্বাপানা।”

“নিজের চোখে দেখলি?”

“দেখার ইচ্ছে ছিল না দাদা,তবে দুপুরে নদীর ধারের মাঠে গোরু বাঁধতে গিয়ে দেখি, দুটো মুনিশ গোছের লোক আর-একটা লোককে মাটিতে ফেলে গলা টিপে মারছে।”

লালমোহনবাবু চুকচুক করে একটা আপশোশের শব্দ করে বললেন, “এঃ, নিজের চোখে একটা খুন দেখব বলে কত কালের ইচ্ছে আমার। ডাকাতি দেখা হয়ে গেছে, এখন একটা খুন দেখতে পেলেই—”

কামাখ্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “সে সাধ আমারও ছিল মশাই। কিন্তু এ খুনটা দেখার পর সাধ ঘুচে গেছে। এখন নিজে কবে খুন হয়ে যাই সেই ভয়ে মরছি।”

বগলাপতি বিরক্ত হয়ে বলল, “অন্য লোকে খুন হল বলে তোর বিপদ কীসের? তুই খুন হবি কেন?”

“আমি যে খুনের সাক্ষী! তারা আমাকে চিনেও রেখেছে।”

বগলাপতি মাথা নেড়ে হতাশ গলায় বললেন, “কেন যে খুনটুনগুলো দেখতে যাস কে জানে বাবা!

খুন কি দেখার জিনিস? এ তো আর থিয়েটার-বায়োস্কোপ নয় রে বাপু তা খুনিগুলো কি তোকে শাসিয়েছে নাকি?”

মাথা নেড়ে কামাখ্যা বলল, “নাঃ। বরং দুর্বুদ্ধির বশে আমিই একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছি!”

“কী কাজ?”

“ভাবলুম মতিলালের জমিটা বায়না করে রেখছি, টাকার জোগাড় নেই বলে রেজিস্ট্রি হচ্ছে না। তা এই মওকায় গেয়ো খুনিগুলোর কাছ থেকে কিছু ঝেঁপে নিই। খুন-হওয়া লোকটার গলায় সোনার চেন, হাতে হিরের আংটি, পকেটে পুরুষ্টু মানিব্যাগ দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। ফস করে হাজার টাকা চেয়ে বসলাম। শাস্ত্রেই আছে বর্বরস্য ধনক্ষয়ং।”

“বলিস কী? তুই তো ডাকাত! টাকাও খেয়েছিস?”

“না দাদা, বলল, তারা বাটু পরিহারের লোক, তার হুকুম না হলে টাকা দিতে পারবে না। শুনেই তো আমার হাত-পা সিটিয়ে গেল। কেঁপেকেঁপে অস্থির। বাঁটুর কানে যদি কথাটা ওঠে তা হলে আমার কী দশা হবে তা বুঝতে পারছেন?”

বগলাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “এ আর বোঝা শক্ত কী? শুনেছি বাটু মানুষকে বেশি কষ্ট দেয় না। কচ করে মুণ্ডখানা নামিয়ে দেয়।”

লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, “আপনি যোগীপুরুষ দাদা, আমার প্রাণটা রক্ষে করুন ! বাটু পরিহারের কাছে টাকা চেয়েছি, এত বড় আস্পর্দা সে কি সহ্য করবে? আমার বউ বলেছে, “তুমি যে কাণ্ড করেছ তাতে সর্বনাশ হবে। বাটু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি বরং ফেরার হয়ে যাও। কিন্তু কী করে ফেরার হতে হয় তাও তো ছাই জানি না! তাই আপনার কাছে আসা। নামধাম পালটেছি বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না। আমি চরহেতমপুরের ‘বৃন্দাবন ঘোষ’ শুনে সবাই হাসছে। আপনি প্রেতসিদ্ধ মানুষ, আমার একটা উপায় করুন!”

বগলাপতি গম্ভীর হয়ে বললেন, “প্রেতসিদ্ধ কি আর এমনিএমনি হওয়া যায় রে? অনেক মেহনত লাগে। খরচাপাতিও আছে। তার উপর তুই বাটু পরিহারের কোপে পড়েছিস, তোকে লুকিয়ে রাখার বিপদ আছে। সব দিক বিচার-বিবেচনা করলে খরচা বড় কম হবে না রে!”

কোমরে প্যাঁচানো লম্বা গোজ বের করে টাকা গুনতে-গুনতে কামাখ্যা বলল, “এই পাঁচশো টাকা এখন রাখুন, পরে দেখা যাবে।”

বগলাপতি উদাস গলায় বললেন, “তা হ্যাঁ রে কামাখ্যা, আমি তো বাজারহাটে যাই না, তাই দরদামও জানি না। তা মানুষের প্রাণের দাম এখন কত করে যাচ্ছে তার খবর রাখিস?”

লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, “সকলের প্রাণের দাম এক নয় দাদা। ল্যাংড়া আমের যা দাম, ফজলির তো আর তা নয়!”

বগলাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “যার দশখানা গা জুড়ে ফলাও সুদের কারবার, যার একখানা মাছের আড়ত আর দুখানা চালু দোকান আছে, তার প্রাণের দাম কত হবে বলে তোমার মনে হয় হে লালমোহন?”

“হিসেব করতে হবে বগলাদা। দরটা চড়া হবে বলেই মনে হয়।”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে। তাই বলছি, এখানে তোর সুবিধে হবে না রে কামাখ্যা, তুই বরং কোনও সস্তা-গণ্ডা জায়গা খুঁজে দ্যাখ। এ হল সাধনপীঠ। স্বয়ং শিব ত্রিশূল হাতে সারা রাত ওই ধুতরো গাছের তলায় চেপে বসে থাকেন। আমার গানাভূত ওই উত্তরপশ্চিম দিকটায় টহল দেয়, বাজান-ভূত সামলায় পুব আর দক্ষিণ দিক। গোটা চত্বর মন্ত্র দিয়ে বন্ধন করা থাকে, মাছিটিও গলে আসতে পারে না। তোর মতো মহাজনের প্রাণের দাম বাবদ মাত্র পাঁচশো রে? নাকি গানা আর বাজানাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে? নাকি মন্ত্রেরই আর জোর থাকবে? তখন বাটু এসে খাঁড়া হাতে দাঁড়ালে আটকাবে কে বাপ? আমার সাধনপীঠে যে রক্তগঙ্গা বইবে!”

বন্দুক-পিস্তল নেই? খাড়া দিয়ে লোকের গলা কাটা, ওটা কীরকম ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটানো তো বর্বরের কাজ! তার চেয়ে গুলিটুলি অনেক ভাল। সাহেবি কেতার জিনিস, তেমন

রক্তটক্তেরও ব্যাপার নেই। মরেও সুখ। পাঁচজনকে বুক ফুলিয়ে বলা যায় যে, গুলি খেয়ে মরেছি! কী বলেন বগলাদা?"

বগলাপতি কথাটার জবাব দিলেন না। একটু ধ্যানের ভাব এল বোধ হয়।

কামাখ্যা গেঁজে খুলে আর পাঁচশো টাকা বের করে বলল, "আমার মতো মনিষ্যির প্রাণের আর ক'টা টাকাই বা দাম? মশামাছি বই তো নই। সেদিন হরিসভার পরানঠাকুর বলছিলেন বটে যে, প্রাণ অতি বায়বীয় জিনিস। দেখাও যায় না, ছোয়াও যায় না, আকৃতি-ওজনও কিছু নেই। তাওরকম হালকাপলকা জিনিসের দাম যে হঠাৎ আজ এত ঠেলে উঠবে তা কে জানত! তা এই হাজার টাকায় কী হবে মশাই? নাকি নয়নপুরে ভায়রাভাইয়ের বাড়ি রওনা দেব!"

একটু সটান হয়ে বগলাপতি চোখ খুলে বললেন, "আহা, আমরা আপনজনেরা থাকতে ভায়রাভাই কেন? বিপদে পড়ে এসেছিস, ফেলি কী করে?"

|| চার ||

সকালবেলায় যখন করালীডাক্তার দাঁতন করছেন, সেই সময় বগলে ছাতা আর হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে বটকৃষ্ণ মণ্ডল এসে হাজির। বটকৃষ্ণ ঝগড়ুটে এবং মামলাবাজ লোক। সবাই তাকে সমঝে চলে।

বটকৃষ্ণ বেশ তড়পানির গলায় বলে উঠলেন, "এটা কী হল হে করালী? কাজটা কি তুমি ভাল করলে? ওতে যে আমার সংসারে অশান্তি হবে, চারদিকে বদনাম রটবে! না না, কাজটা তুমি মোটেই ভাল করেনি! তুমি বিচক্ষণ নও তা জানি। দুরদর্শনও তা-ও কারও অজানা নেই। তা বলে এক গাঁয়ে থেকে এরকম শত্রুতা করবে, এটা তো বরদাস্ত করা যায় না!"

করালী উত্তেজিত হলেন না। দাঁতনের ছিবড়ে ফেলে বললেন, "তাই নাকি? তা হলে তো ভাবনার কথা!"

"কোন আক্কেলে আমার শালাকে তুমি নিজের বাড়িতে তুললে? এটা ঠিক যে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়। মুখ দেখাদেখিও নেই। মামলা চলছে। আর আমার এই সেজো শালাটিকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। অতি বখাটে ছেলে। কিন্তু তা বলে আমি বেঁচে থাকতে এ গাঁয়ে এসে সে অন্য বাড়িতে উঠবে, এটা কেমন কথা? বুঝতে পারছি, আমাকে অপমান করার জন্যই ষড়যন্ত্র করে এটা করা হয়েছে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রে যে তুমিও আছ এটা কখনও ভাবিনি। শুনে অবধি আমার গিন্নি তো কেঁদেকেটে শয্যা নিয়েছেন। তোমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হতে পারে তা জানো?"

করালী ঘটির জলে কুলকুচো করতে করতে মুখের জলটা ফেলে বললেন, "তাই বলুন ! আপনার শালা! আমি ভাবলাম কে না কে! তা আপনার শালা যদি আপনাকে ভগ্নিপতি বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়, তা হলে আমার কী করার আছে বলুন তো!"

বটকৃষ্ণ চোখ কপালে তুলে বললেন, "অ্যাঁ! কী বললে! এই বটকৃষ্ণ মণ্ডলের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়! জানো, আমি যখন জামাই হয়ে প্রথম বিষ্টুপুর গেলুম, তখন সেখানে ঘরে-ঘরে দেওয়ালি হয়েছিল? আমার এক মামাশ্বশুর কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন, বটকৃষ্ণ বটগাছের মতো স্থির আর অবিচল! আর কৃষ্ণের মতোই বিচক্ষণ। আমার শাশুড়ি ঠাকরুন তো এখনও বলেন, 'বট-র মতো জামাই চট করে দেখা যায় না। ওরে বাপু, ঝগড়াঝাটি আছে বটে, কিন্তু তা বলে হ্যাটা করার উপায় নেই।"

করালীডাক্তার ধরে সুস্থে কুলকোচো সেরে কাঁধের গামছাখানায় মুখ মুছতে-মুছতে বললেন, "অত কথায় কাজ কী মশাই? ছোকরাকে যদি আপনার শালা বলে মনে হয় তা হলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান না!"

বটকৃষ্ণ বুক চিতিয়ে বললেন, "নিয়ে যাবই তো! এ তো আর তোমার শালা নয়। আমার শালাকে আমি নিয়ে যাব, কে আটকায় দেখি!"

বলে বটকৃষ্ণ সবেগে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। একটু পরেই মাথা নাড়তে-নাড়তে বেরিয়ে এসে, "দুর দুর! সকালটাই নষ্ট!"

একটু পরেই রুদ্রাক্ষের মালা গলায় নবকুমার এসে পড়ল। মুখে বিনয় মাখানো হাসি। গলা খাটো করে রসস্থ মুখে বলল, "ডাক্তারবাবু! শুনলুম, কাল রাতে মথুরাপুরের রাজাবাহাদুর ছদ্মবেশে এসে আপনার বাড়িতেই উঠেছেন ! কী সৌভাগ্য!"

করালীডাক্তারও গলা খাটো করে বললেন, "চুপ! চুপ! পাঁচজনে জানতে পারলে যে ধুন্ধুমার লেগে যাবে! কাউকে বলে দিয়ো না যেন!"

নবকুমার গ্যালগ্যালে মুখে বলল, "আরে না, না। এসব গুহ্য কথা কি পাঁচকান করতে আছে! তা এই অঘোরগঞ্জের মতো জায়গায় রাজা-গজার আগমন তো চাট্টিখানি কথা নয়! বলি আপ্যায়ন-টাপ্যায়ন ঠিকমতো হচ্ছে তো! বলেন তো বাড়ির গোরুর দুধ একঘটি দিয়ে যেতে পারি। আর সীতাপতি ভাণ্ডারের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা। রাজত্ব নেই বটে, কিন্তু তবু রাজা তো!"

"সে তো ঠিক কথাই হে নবকুমার। মরা হাতি লাখ টাকা।"

নবকুমার বিদায় হওয়ার পর খুবই উৎকণ্ঠিত মুখে হাঁফাতে হাঁফাতে শিবকালীবাবু এসে হাজির। চোখ বড়-বড় করে বললেন, "ওহে করালী, তোমার বাড়িতে নাকি বোমা-বন্দুক নিয়ে কে এক উগ্রবাদী ঢুকে পড়েছে! এ তো সর্বনেশে কথা! বলি, তোমরা সব বেঁচেবর্তে আছ তো!"

করালী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আধমরা হয়ে আছি দাদা!"

"পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিয়েছ তো!"

"এখনও দেওয়া হয়ে ওঠেনি বটে, একটু ফাঁক পেলেই থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসব।"

শিবকালী সবেগে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই অবশ্য। উগ্রবাদী ঢুকেছে জেনে আমি সকালবেলাতেই থানায় হানা দিয়েছিলাম। মনোহর দারোগার কাঁঠাল খেয়ে পেট ছেড়েছে। উগ্রবাদী শুনেই আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা, উগ্রবাদীর মোকাবিলা করার সাধ্যি আমাদের নেই। থানায় মোট পাঁচটা বন্দুক, তার মধ্যে তিনটে মরচে ধরে ঠান্ডা মেরে গেছে। একটায় কুঁদো ভেঙেছে, আর-একটা চলনসই আছে বটে, কিন্তু তাতে ভরার মতো টোটা নেই। টোটাগুলো বহুকাল ব্যবহার না হওয়ায় বারুদ সেতিয়ে মাটি হয়ে গেছে। পাঁচজন সেপাইয়ের তিনজন দেশে গেছে, বাকি দুজন দারোগাগিন্নির ফাইফরমাশ খাটতে ব্যস্ত। মনোহর বলেই দিল, উগ্রবাদীর জন্য পুলিশের কী দরকার, আপনারা হুড়ো দিন, টিন, ক্যানেস্তারা পেটাতে থাকুন। পুলিশ আসছে বলে ভয় দেখান। দেখবেন ঠিক পালিয়ে যাবে। "

করালী বিরস মুখে বললেন, "তা অবশ্য যাবে। তবে তাড়া নেই। উগ্রবাদীটা এখন ঘুমোচ্ছে। আপনারা ততক্ষণে ক্যানেস্তারা-ট্যানেস্তারা জোগাড় করুন, লোকজন জুটিয়ে আনুন।"

শিবকালী চোখ কপালে তুলে বললেন, "ঘুমোচ্ছে! উগ্রবাদীটা ঘুমোচ্ছে! এ তো ভাল কথা নয়! দেশটা যে অরাজকতায় ভরে গেল হে! জন্মে কখনও শুনিনি যে, উগ্রবাদীরা ঘুমোয়!"

করালী ব্যথিত গলায় বললেন, "ঠিকই বলেছেন, খাঁটি উগ্রবাদীই কি দেশে আর আছে?"

"না, এর একটা বিহিত করতেই হবে।" বলে উত্তেজিত শিবকালী প্রস্থান করলেন।

বেলা নটা নাগাদ হতে একটা বল্লম নিয়ে ব্যায়ামবীর বিরজা এসে বলল, "করালীবাবু, শুনলুম ডাকাতটা নাকি আপনার বাড়িতেই লুকিয়ে আছে?"

"আছেই তো!"

"আপনি কি জানেন ওর মাথার দাম দশ হাজার টাকা?"

"এ তো পুরনো খবর। সবাই জানে।"

"ডাকাতটার কাছে বন্দুক-পিস্তল নেই তো!"

"তা আর নেই! কোমরে দুটো পিস্তল, আর ঝোলা ব্যাগে গোলগোল কী যেন দেখছিলাম বটে! বোমা হতেও পারে!"

বিরজা একটু দমে গিয়ে বলল, "আপনি বরং ওকে আমার কাছে সারেন্ডার করতে বলুন। সারেন্ডার করলে আমি বেশি কিছু করব না। শুধু আলগোছে নিয়ে গিয়ে সরকার বাহাদুরের হাতে জমা করে দেব।"

করালী সপ্রশংস গলায় বললেন, "তোমার মতো ডাকাবুকো ছেলেই তো গাঁয়ের ভরসা। ডাকাতটার কপালে কষ্ট আছে দেখছি। কিন্তু আমি বলি কী, একটু রয়েসয়ে এগনোই ভাল। তুমি বীর এ তো সবাই জানে! আর বল্লমও ক্ষেত্রবিশেষে অস্ত্র হিসেবে মন্দ নয়। কিন্তু গুলিটুলি ছুটলে লেগেটেগে যেতে পারে তো!"

বিরজা দেড় পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "বেশি দেরি করা কি ঠিক হবে? খবর চাউর হয়ে গেলে মেলা ভাগীদার জুটে যাবে যে!"

করালী গলা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, "সেটাও একটা চিন্তার কথা বটে ! ডাকাত তো মোটে একটা। আর খবরও সবাই জানে কিনা! দশ হাজার টাকা যে কত ভাগে ভাগ হবে কে জানে! খুঁজে পেতে দ্যাখো তো আর দু-চারটে ডাকাত পাও কিনা!"

এ কথায় বিরজা কী বুঝল কে জানে। তবে মুখটা শুকনো করে চলে গেল।

একটু বেলার দিকে জটেশ্বর এসে হাজির হতেই করালী খাপ্পা হয়ে বললেন, "এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ!"

জটেশ্বর নিরুদ্বেগ মুখে বারান্দার চেয়ারে বসে বললেন, "তা তো বটেই। কিন্তু কোন কাজটার কথা বলছ? সারাদিনে লোকের শতেক কাজ থাকে। কোন কাজটার কথা হচ্ছে সেটা খোলসা করে না বললে বুঝব কী করে?"

"লোকটার কথা সারা গাঁয়ে রটিয়ে বেড়িয়েছ, আর সকাল থেকেই নানা মতলবে নানা লোক এসে হাজির হচ্ছে।"

“আহা, রটাতে যাব কেন? অঘোরগঞ্জ ছোট জায়গা, হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে যায়। বটব্যালের বাতব্যাধি থেকে আটলবাবুর পটলতোলা অবধি কোন খবরটা গোপন আছে বলতে পার? তা তোমার অতিথির খবর কী? সে কি এখনও বেঁচেবর্তে আছে? তোমার চিকিৎসায় তো তার পটলতোলার কথা! তোলেনি এখনও?”

করালী চিন্তিত মুখে বললেন, “না হে।”

জটেশ্বর উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, “এখনও গ্যাট হয়ে বসে আছে নাকি?”

“মরার মতো অবস্থা নয়। তবে তার কিছু মনে পড়ছে না। এমনকী শঙ্কাহরণ, বিপদভঞ্জন আর গিন্নি মিলে অনেক চেষ্টা করেও তাকে কথা পর্যন্ত বলাতে পারেনি। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।”

“সর্বনাশ! তবে তো ভাল জ্বালা হল!”

“তা হল। জলে ডুবে থাকলে অনেক সময় এরকম হতে পারে। তার উপর গুলি লেগেছে।”

“আরে, একটা তেজি ওষুধ বা ইনজেকশন দাও না ঠুকে! নইলে এক দলা চ্যবনপ্রাশ খাইয়ে দাও। সঙ্গে একোনাইট থার্টি বা পালসেটিলা…”

করালী ভ্রু কুঁচকে বললেন, “আর ডাক্তারি বিদ্যে ফলিয়ো না তো! ওটা পয়সা খরচ করে শিখতে হয়, বুঝলে?”

“পয়সা খরচ করলেই কি আর শেখা যায় হে! তা হলে তো তুমিও শিখতে! একটা জলেডোবা রুগিকে ভাল করতে পারলে না, আবার ডাক্তারি শেখাচ্ছে! যাও, বরং বউঠানকে চায়ের কথাটা বলে এসো গিয়ে?”

করালীডাক্তার জটেশ্বরের দিকে রোষকষায়িত লোচনে একটু চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “ডাক্তার ভগবান নন, এটা মনে রেখো!”

“যাক, পাপমুখে তবু ভগবানের নামটা উচ্চারণ করলে। আজ ভগবান যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছেন কে জানে। তা তোমার ডাক্তারি বিদ্যেয় যখন হল না, তখন আমিই বরং ছোকরাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখি?”

“কী দেখবে, কুষ্ঠি না কররেখা? দুটোর কোনওটাই তো তুমি জান না। বুজরুকি দিয়ে কি আর সব হয়? দেখতে চাও, দেখতে পারো। আমার আপত্তি নেই!”

“যা দেখার আমি কালকেই দেখে নিয়েছি। শুধু কররেখা আর কোষ্ঠীই নয় হে, কপাল দেখেও অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়। ওসব তুমি বুঝবে না।”

“তা কপাল দেখে কী বুঝেছ সেটাই না হয় বলো।”

“তা তোমাকে বলতে যাব কেন? বিদ্যেটা আমাকেও পয়সা খরচ করেই শিখতে হয়েছে।”

“পয়সা খরচ করে কেউ জ্যোতিষ শেখে নাকি? গুল-গল্প আর মিথ্যে কথা বলতে কি আর বিদ্যের দরকার হয় হে?”

জটেশ্বর একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "বিদ্যে না লাগলেও প্রতিভার দরকার হয়। এখন বলো তো বাপু, ছোকরাকে সত্যিই কেউ গুলি করেছিল নাকি?"

করালীডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, "সেটাই মনে হচ্ছে। তবে ইনজুরি সামান্য, পেটের একধার দিয়ে গুলি ঢুকে বেরিয়ে গিয়েছে। রক্তপাত হলেও ক্ষত মারাত্মক নয়। আইনমতো ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার।"

জটেশ্বর হাত তুলে বললেন, "রক্ষে করো বাপু, ও কাজ আর করতে যেয়ো না! মনোহরদারোগা বোমা-বন্দুক শুনলেই মুর্ছা যায়।"

করালীডাক্তার ভাবিত মুখে বললেন, "ছোকরা গুন্ডা-বদমাশের পাল্লায় পড়েছিল বলেই মনে হয়। আবার এও হতে পারে যে, ছোকরা নিজেও ওই দলেরই। গুন্ডারা গুন্ডার হাতেই বেশি মরে। কিন্তু স্মৃতি না ফিরলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ইতিমধ্যে আমার গিন্নি তো ছেলেটাকে প্রায় কোলে নিয়ে বসে আছেন। আদর করে নাম দিয়েছেন 'ভোলানাথ'। ছেলেপুলে নেই বলে অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে দেখলেই ওঁর মাতৃভাব উথলে ওঠে।"

"উনি তোমার মতো পাষণ্ড নন বলেই ওরকম করেন। কিন্তু তুমি তো চিন্তায় ফেলে দিলে হে!"

"চিন্তারই কথা। ছোকরার মানিব্যাগে হাজার পাঁচেক টাকা আছে। গলায় সোনার চেন আর হাতে হিরের আংটি মিলিয়ে বিশপঁচিশ হাজার টাকার পাল্লা। কবজির ঘড়িখানাও বিদেশি। রীতিমতো মালদার লোক।"

"মানিব্যাগে কাগজপত্র কিছু পেলে না?"

"সেগুলো জলে ভিজে প্রায় গলে গেছে। টাকাগুলোরও ওই একই দশা। শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন সেগুলোকে ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে শুকিয়ে এনেছে। নাঃ, নাম-ধাম, পরিচয় কিছুই জানার উপায় নেই। ছেলেটা কথা কওয়া শুরু করলেই একমাত্র হদিশ পাওয়া যেতে পারে।"

"মুক-বধির নয় তো?"

"না। শুনতে পাচ্ছে। আমার গিন্নি যা বলছে তা লক্ষ্মীছেলের মতো শুনছে। 'খাও' বললে খাচ্ছে, দাঁড়াতে বললে দাঁড়াচ্ছে, বসতে বললে বসছে।"

কাল রাতে বিভূতিবাবুদের বিড়ালটা এমন বিচ্ছিরি খক-খক করে শব্দ করছিল যে, সুরবালা ভারী ভয় পেয়ে গেলেন। অবশ্য সুরবালার ভয় আর দুশ্চিন্তার কোনও অবধি নেই। চারদিকে এত বিপদআপদ আর ভয়ভীতি নিয়ে যে কী করে মানুষ বেঁচেবর্তে আছে, সেটাই তিনি বুঝতে পারেন না। চারদিকে সর্বদাই নানা অমঙ্গলের সংকেত দেখতে পান তিনি। তাই বিড়ালটার ওই শব্দ শুনে করালীডাক্তারকে গিয়ে ভারী মিষ্টি করেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হ্যাঁ গো, বিভূতির বিড়ালটার কি কাশি হয়েছে?"

করালীডাক্তার খিটখিটিয়ে উঠে বললেন, “তা হতেই পারে। বিড়ালের কাশি হয়, বাঘের মৃগী হয়, কুমিরের ম্যালেরিয়া হয়, গাছের বাতব্যাধি হয়। বিচিত্র কী?”

“আহা, রেগে যাচ্ছ কেন? আসলে ভোলানাথের তো ভীষণ জ্বর। বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। ভাবছিলাম, বিড়ালটা তো এরকম অদ্ভুত শব্দ কখনও করে না, কোনও অমঙ্গল হবে না তো গো ছেলেটার?”

করালীডাক্তার খুবই তেতো গলায় বললেন,“আচ্ছা, আমি একজন এম বি বি এস পাশ, তিরিশ বছর প্র্যাকটিস করা ডাক্তার হয়েও যদি ভোলানাথের অবস্থা বুঝতে না পারি, তা হলে কি বিভূতির বিড়াল বেশি বুঝবে?”

সুরবালা ছলছলে চোখে বললেন, “তা তো বলিনি। বলছিলাম কী, অবোলা প্রাণীরা তো অনেক কিছু টের পায়। শুনেছি, গিরগিটির ভূমিকম্পের আগে টের পায়। পিঁপড়েরা বন্যার আগে টের পায়। এই তো সেদিন ভূষণবাবু মারা যাওয়ার আগের রাতে ভুলো কুকুরটা কেমন ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিল।”

“ভূষণবাবুর কত বয়স হয়েছিল জানো? একশো তেরো বছর। ভূষণবাবুর বড় ছেলের বয়স নব্বই, মেজোর উননব্বই, আর ছোট ছেলের সাতাশি। ভূষণবাবু মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে তিন বুড়োর সে কী ঝগড়া, হাতাহাতির উপক্রম। তা তারাই কেউ কাঁদল না, ভুলো কুকুরের কোন গরজ পড়েছে ভূষণবাবুর জন্য চোখের জল ফেলার ?”

“তুমি যে কিছুই গ্রাহ্যি করো না, এ কিন্তু ভাল নয়। একটু আগে যে একটা প্যাঁচা অদ্ভুতভাবে ডাকছিল, সে কি এমনি?”

করালীডাক্তার নির্বাকভাবে বললেন,‘ডাকার জন্যই প্যাঁচারা মাইনে পায়।”

এ কথায় সুরবালার পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। করালীডাক্তারকে তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন।

ছেলেটাকে দেখা ইস্তক তাঁর বড্ড মায়া পড়ে গেছে। কী সুন্দর কেষ্টঠাকুরের মতো মুখখানা। তার নিজের একটা ছেলে থাকলে আজ এত বড়টিই হত। কোন বাড়ির ছেলে, কোথা থেকে এল, কী হয়েছিল, কিছুই জানার উপায় নেই। যতক্ষণ হুশ ছিল একটাও কথা বলতে পারেনি। করালীডাক্তার বলেছেন, স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। শুনে অবধি সুরবালার মনটা হায়-হায় করছে। সারা রাত উঠে-উঠে গিয়ে তার নাকে হাত দিয়ে দেখেছেন, শ্বাস চলছে কি না, জ্বর কমেছে কি না। আর সারা রাত কত যে অলক্ষুনে শব্দ শুনেছেন তার হিসেব নেই। এই শিয়াল ডাকল তো ওই শোনা গেল তক্ষকের শব্দ। হঠাৎ একটা কাক খা-খা করে উঠল। এই কুকুরের ঝগড়া তো ওই বিড়ালের ফ্যাঁস-ফ্যাঁস। সুরবালার স্থির বিশ্বাস, এসব মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। কিন্তু করালীডাক্তারকে বলে তো কোনও লাভ নেই।

সকালে দেখা গেল, ভোলানাথের জ্বর একটু কম। চোখ চেয়ে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজছে। বাচ্চারা মা ছাড়া এ সময়ে আর কাকেই বা খুঁজবে? সুরবালা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে বললেন, “কাকে খুঁজছ বাবা? মাকে?”

ভোলানাথ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। মুখে কথা নেই।

“তোমার বাড়ি কোথায় বাবা? বাড়িতে কে কে আছে?”

ভোলানাথ জবাব দিল না। অনেক চেষ্টা করে সুরবালা হাল ছাড়লেন। তারপর শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জনকে ডেকে বললেন,“শোন বাবারা, ডাক্তারি চিকিৎসায় আমার যেন কেমন ভরসা হচ্ছে না। তোরা বরং লুকিয়ে বগলাঠাকুরকে একটা খবর দিয়ে আয়। প্রেতসিদ্ধ মানুষ, শুনেছি মন্তরতন্তরের জোর আছে। এই তো সেদিন বাসন্তীর হারানো ছাগলটা খুঁজে দিল। পুণ্যবাবুর বাতব্যাধি সারিয়ে দিল।”

শঙ্কাহরণ চোখ বড়-বড় করে বলল, “কিন্তু মাঠান, বগলাঠাকুরের আগমন হলে যে কর্তাবাবু আমাদের আস্ত রাখবেন না। বগলা তান্ত্রিকের উপর যে উনি সাংঘাতিক খাপ্পা। চোর, ধাপ্পাবাজ, শয়তান কত কী বলেন !”

“উনি কার উপর খাপ্পা নন, বল তো! সবাইকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন বলেই তো গাঁয়ের লোক ওঁকে পছন্দ করে না। আজকাল তো অনেকের বিয়ে বা শ্রাদ্ধে আমাদের নেমন্তন্ন হয় না।”

বিপদভঞ্জন বলল, “গাঁয়ের লোকগুলোর কথা আর কবেন না মাঠান। প্রাণ নিয়ে টানাটানি হলে করালীডাক্তারের পায়ে পড়ে। কিন্তু কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে আর চিনতে চায় না।”

“তা সে যাই হোক, বেলা দশটায় উনি চেম্বারে যাবেন। তখন গিয়ে চুপটি করে ডেকে আনিস। মন্তরতন্তরে অনেক সময় কাজ হয়।”

শঙ্কাহরণ মাথা চুলকে বলল, “কিন্তু গেলবার কর্তবাবুর রুগি চারু ঘোষকে বগলাবাবা জলপড়া খাইয়েছিলেন বলে কর্তাবাবা দা নিয়ে এমন তাড়া করেছিলেন যে, বগলাপতি পাইপাই করে ছুটে সেই শ্বশুরবাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিন মাস এমুখো হননি। শেষে বগলাপতির শালা-সম্বন্ধীরা এসে কর্তাবাবার হাতে-পায়ে ধরে বগলাপতিকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

|| পাঁচ ||

সন্ধের পর বগলাপতি সাধনপীঠে থাকেন না, বাড়ি ফিরে যান। একদিন কালীভক্ত গোবিন্দ ঘোষাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বাপু হে, একখানা সাধনপীঠ তো বোকা লোকদের মাথায় হাত বুলিয়ে বানিয়ে নিয়েছ। তা নিশুত রাতে সাধন-ভজন না করে গুটিগুটি বাড়ি গিয়ে সেঁধোও কেন? কীরকম সাধক হে তুমি?"

বগলাপতি বললেন, "না দাদা, আমার বড় সর্দির ধাত। নদীর ধারের ভেজা বাতাস আমার সহ্য হয় না। ঠান্ডা লেগে যায়।"

"হাসালে ভায়া! যারা সাধন-ভজন করে তাদের গা এত গরম হয়ে ওঠে যে, হলকা বেরোয়। ওই হলকা ফুঁড়ে জোলো বাতাসের সাধ্যি কী শরীরের ভিতরে ঢুকবে!"

বগলাপতি অতি বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, "তা তো বটেই। আমার শরীরে তো একশো দশ ডিগ্রি অবধি তাপ উঠে যায়। সেই অবস্থায় আমাদের মেনি বিড়ালটা একবার কোলে এসে বসেছিল। পরদিন তার গায়ে দেখি, বড়-বড় ফোস্কা। কিন্তু কথা কী জানেন, ওই ধ্যান যেই শেষ হয় আমনই হু-হু করে তাপটা নেমে যায়, আর তখনই ঠান্ডাটা লাগে।"

গোবিন্দ ঘোষাল বিছুটি হাসি হেসে বললেন, "লোকে কিন্তু অন্য কথাও বলে!"

বগলাপতি উদাস মুখে বললেন, "লোকে যা বলে তাও মিথ্যে নয় দাদা। লোকে বলে, আমি নাকি আসলে ভূতের ভয়ে পালিয়ে যাই। তা সেটা অস্বীকার করি কী করে? ঠিক ভূতের না হলেও ভূতের গানবাজনার ভয়ও তো আছে!"

গোবিন্দ ঘোষাল অবাক হয়ে বললেন, "ভূতের গানবাজনা! সে আবার কী জিনিস হে?"

"আর কবেন না দাদা! আমার তো দুটি বই ভূত নেই। দুটিই অতি নচ্ছার দেহাতি ভূত। রাতবিরেতে তাদের একজন বেতালে ঢোল বাজায় আর অন্যজন বেসুরো গলায় গান গায়। ওই জন্যই তো দু'জনের নাম দিয়েছি গানা-বাজানা। তাদের গানবাজনার ঠেলায় সাধনপীঠে কি শান্তিতে থাকবার যো আছে মশাই? রাত ভোর হওয়ার আগে তা ক্ষান্ত হয় না।"

গোবিন্দ ঘোষাল আর কথা বাড়ননি। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "তুমি খুব উঁচুদরের সাধক হে, চালিয়ে যাও!"

বগলাপতি নির্বিকারভাবে বললেন, "কথাটা লিখে দেবেন দাদা, বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখব।"

তা কাল রাতেও বগলাপতি যখন বাড়িমুখে রওনা দিচ্ছেন তখন কামাখ্যা আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, "আমাকে এখানে একা ফেলে যাচ্ছেন, ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে কী হবে?"

বগলাপতি অবাক হয়ে বললেন, "একা! একা কেন রে? দুনিয়ায় কি একা হওয়ার যো আছে? এই তো ক্ষিতিবাবু আছেন, অপরেশবাবু আছেন,

তেজেন্দ্রবাবুও হাজির! মরুৎবাবুও জেঁকে বসে আছেন, ব্যোমকেশবাবুকে তো নড়ানোই যায় না। পাঁচজনে গলাগলি ভাব। পঞ্চভূত বলে কথা!"

কামাখ্যা সন্দিহান হয়ে বলল, "এরা সব কারা মশাই ? লোক ভাল তো?"

"বিশিষ্ট লোক রে, সব বিশিষ্ট লোক! ওই যে আমগাছটা দেখছিস, ওটা আবার কথাটথা কয়। রাতবিরেতে কান পাতলে শুনবি এদিককার এই কদম গাছটার সঙ্গে চাপানউতোর চলছে।"

"বলেন কী মশাই! গাছে-গাছে ঝগড়া! জন্মে শুনিনি!"

"তবে আর সাধনপীঠের মহিমা কী? তারপর ধর বাতাসে গিজগিজ করছে অশরীরীদের ভিড়, তাদেরও কত সুখ-দুঃখের কথা আছে। সারা রাত গুজগুজ ফিসফাস, কোনও বউ হয়তো শাশুড়ির গঞ্জনার কথা কয়, কোনও কেরানি হয়তো উপরওলার অত্যাচারের কথা কইতে গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদে, কত রাজাগজা এখনও তম্বি করে বেড়ায়। হ্যাঁ রে কামাখ্যা, তুই কি ইঁদুরের বা বাদুড়ের ভাষা বুঝতে পারিস?"

কামাখ্যা কাচুমাচু হয়ে বলল, "আজ্ঞে না, ওটা শেখা হয়ে ওঠেনি।"

"শিখে রাখলে পারতি রে! এখানে বলিয়েকইয়ে ইঁদুর আর গল্পবাজ বাদুড়ের অভাব নেই কিনা! একটা ইঁদুর হয়তো ঘরে ঢুকে তোকে দেখেই থতমত খেয়ে বলে উঠল, "এই যে কামাখ্যাবাবু, নমস্কার! কী সৌভাগ্য আমাদের! তা আপনি এখানে যে! কোনও বিষয়কর্ম আছে নাকি? ভাষাটা বুঝলে তুইও তখন গল্প ফেঁদে বসে যেতে পারতিস। কিংবা ধর, ছোট-বাইরে করতে বেরিয়েছিস, হঠাৎ একটা বাদুড় এসে তোকে দেখে ভারী খুশি হয়ে বলল, ও মা! কামাখ্যাবাবু না? এঃ, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন দেখছি! তা বন্ধকি কারবারটা কেমন চলছে? ভাষাটা ধরতে পারলে তুইও তখন দিব্যি গল্পগাছা করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারতিস।"

কামাখ্যা মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, ইঁদুর-বাদুড়ের সঙ্গে কথা কয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করতে পারব না।"

"আহা, তা তো বটেই। তবে কিনা, কথাটা হল, একা হওয়ার কি যো আছে রে? মিলেমিশে থাকলে দেখবি মোটেই একা লাগবে না।"

কামাখ্যা হতাশ হয়ে বলল, "ভূত-প্রেত, কথা-কওয়া ইঁদুর, আড্ডাবাজ বাদুড়, মশাই, আর বাকি রইল কী? এ তো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি!"

মুশকিলটা হল রাত্রে। বগলাপতি আর লালমোহন বিদায় হওয়ার পর কামাখ্যা ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের আলোয় যা ব্যবস্থাদি দেখতে পেল, তাতে খুশি হওয়ার কথা নয়। কেরাসিন কাঠের নড়বড়ে চৌকির উপর একটা কালো কুটকুটে কম্বল পাতা। বালিশটালিশ নেই। ঘরের দরজায় বাটাম আছে বটে কিন্তু কপাটের এমনই অবস্থা যে, বিড়ালে গা ঘষলেও দরজা ভেঙে পড়বে। অশরীরী পাহারাদারদের উপর তেমন ভরসা নেই কামাখ্যার। কপাটটা মজবুত হলেও না হয় কথা ছিল! বাটু পরিহার যে রাতবিরেতে এসে হাজির হবে না এমন কোনও কথা নেই। বাটুকে হাড়ে হাড়ে চেনে কামাখ্যা। সেবার গোঁসাইপাড়ায় নপু

গোঁসাঁইয়ের বাড়ি মালসাভোগের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে বাটু পরিহারের চকচকে পাম্পশু মাড়িয়ে ফেলেছিল সে। তা নেমন্তন্ন বাড়িতে ওরকম তো হয়েই থাকে। জুতোজোড়া যে বাটুর তা তো আর সে জানত না। আর এও জানা ছিল না যে, বাটুর জুতোজোড়ার উপর নজর রাখার জন্য একজন পাহারাদার মোতায়েন আছে।

"বাটুবাবুর জুতোয় পা দিস, কে রে তুই? ঘাড়ে কটা মাথা?" বলে মুশকো চেহারার পাহারাদারটা তেড়ে এল। চারদিকে ভয়ে আতঙ্কে তুমুল চেঁচামেচি আর ছোটাছুটি পড়ে গেল। সবাই জানে, বাটুর কাছে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনও দণ্ড নেই। আর মৃত্যুদণ্ডটাও খুবই সরল ও সংক্ষেপ। ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেওয়া। কামাখ্যার সেদিনই হয়ে গিয়েছিল। তবে বরাতজোরে অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে যায়। নন্দবাবুই এসে বাটুকে ধরে বললেন, "ও বাবা বাটু, আজ পুজোকাটালি দিন, গোঁসাইবাড়িতে রক্তপাতটা কোরো না বাবা?"

তা বাটুরও সেদিন মেজাজটা ভাল ছিল। তাই মোটে দশবার সকলের সামনে কান ধরে ওঠবোস করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল বাটু। বরাতজোরে ঘাড়টা সেদিন বেঁচে যায় বটে, তবে ঘটনাটা মনে পড়লে ঘাড় আজও সুড়সুড় করে।

কুটকুটে কম্বলের বিছানায় শুয়ে কি ঘুম আসতে চায়! অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে বোধ হয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমোবে তার উপায় কী? একে তো পেটে দানাপানি নেই, ভয়ের তাড়ায় খাওয়ার কথাই ভুলে মেরে দিয়েছে। তার উপর ঘুমোলেই নানারকম ভয়ের স্বপ্ন এসে হাজির হয়। আর কামাখ্যা চমকে জেগে ওঠে। তার উপর ইঁদুর দৌড়োয়, বিড়াল ডাকে। একপাল শিয়াল এসে উঠোনে বসে তারস্বরে হুক্কাহুয়া করে গেল। আর সত্যিই বাতাসে নানারকম ফিসফাস শব্দ শুনতে লাগল সে।

ছোট-বাইরে সারতে দরজা খুলে ঘরের পিছন দিকটায় একটু গিয়েছিল সে। মাঝরাতে খুব ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। ফিরে আসবার সময় হঠাৎ দেখতে পেল দুটো পেল্লায় চেহারার লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে। বুকটা এমন ধক করে উঠেছিল যে, আর-একটু হলেই কেঁপে-কেঁপে মুর্ছা যেত। তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গিয়ে উকি মেরে দেখল, একজনের হাতে টর্চ, অন্যজনের হাতে একটা পিস্তলের মতো কিছু রয়েছে। টর্চ হাতে লোকটা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে চারদিকে আলো ফেলে কী যেন দেখল। তারপর বেরিয়ে এসে চারদিকটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে মাথা নেড়ে বলল, "এখানে কেউ নেই।"

এরা যে বাটু পরিহারের লোক এবং তাকেই খুঁজতে এসেছে, এ বিষয়ে কামাখ্যার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। অতি সন্তর্পণে সে পিছু হটে ঝোপজঙ্গলের ভিতরে সেধিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বগলাঠাকুর যে ক্ষিতিবাবু, অপরেশবাবু, তেজেনবাবুর কথা বলেছিল, এই দু'জন কি তাদেরই কেউ নাকি রে বাবা! গান-বাজনা ভূতের কথাও হয়েছিল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে ভূত-ভূত ভাবটাই তো নেই। আড়াল থেকে খুব নিবিষ্ট হয়ে

দু'জনের গতিবিধি নজর করছিল কামাখ্যা। টর্চের আলো তার দিকেও বারকয়েক ধেয়ে এল, কিন্তু ঝোপের আড়ালে সেটে থাকায় তাকে নজরে পড়ার কথা নয়। তবু কামাখ্যা আরও একটু গুটিসুটি মেরে উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলল,"গতিক বড় সুবিধের নয়।"

খুব মিহিন গলায় পিছন থেকে একটি প্রতিধ্বনি এল, না, গতিক মোটেই সুবিধের নয়।'

কামাখ্যা ব্যাপারটা প্রথমে খেয়াল না করে ফের বলল, "বাটুর লোক বলেই তো মনে হচ্ছে।"

মিহিন গলাটা ফের বলল, "হতেই পারে।"

কামাখ্যা এবার খেয়াল করল এবং তার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল ভয়ে। কে বলল কথাটা! অ্যাঁ! কে তার পিছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে! ভয়ে ঘাড়টা এমন শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর অবধি জো নেই। কাঁপা-কাপা কাহিল গলায় সে বলল, "কে আজ্ঞে? কে আপনি?"

কানের কাছে মুখ এনে মিহিন গলা বলল, "নামধাম বলার উপায় নেই মশাই। ছদ্মবেশে আছি কিনা! বিপজ্জনক কাজে বেরোলে ছদ্মবেশ ছাড়া চলে না। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, নকল দাড়িগোফগুলো বড্ড কুটকুট করে।"

কামাখ্যার এবার একটু সাহস হল। ঘাড়টাও ঘোরাতে পারছে এখন। একটু বাকা চোখে তাকিয়ে দেখল, বেঁটেমতো রোগা গোছের একটা লোক। দাঁড়িগোফ আছে, পরনে শার্ট আর প্যান্ট, হাতে একখানা মজবুত লাঠি।

লোকটা উঠোনের দুটো ষন্ডার গতিবিধি লক্ষ করতে-করতে অতি চাপা স্বরে বলল, "জ্যোৎস্না রাত আপনার কেমন লাগে মশাই?"

কামাখ্যা এখনও ঘাবড়েই আছে। হঠাৎ জ্যোৎস্নার কথা উঠছে কেন তা বুঝতে না পেরে বার দুই গলাখাকারি দিয়ে নিল। কোন কথার মধ্যে কোন প্যাঁচ আছে কে জানে বাবা! আমতা-আমতা করে বলল, "জ্যোৎস্না তো আর খারাপ জিনিস নয়। বেশ একটা দুধ-ভাত দুধ-ভাত ভাব আছে। লোকে তো জ্যোৎস্না রাতকে ভালই বলে।"

দুর-দুর! জ্যোৎস্না অতি নচ্ছার জিনিস। গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করার জো আছে? অন্ধকারের অনেক সুবিধে। রাতবিরেতে যাদের কাজেকর্মে বেরোতে হয়, জ্যোৎস্নায় তাদের ভারী মুশকিল। এই যে আপনি বিষয়কর্মে বেরিয়েছেন, আপনারই কি কিছু সুবিধে হচ্ছে?

গেরস্তবাড়িতে সিঁদ দেবেন, কি জানালা ফাঁক করবেন, কিংবা গ্রিল কাটবেন, বাড়ির কর্তা উকি মেরে দেখে চিনে ফেলল আপনাকে কী কেলেঙ্কারি বলুন তো!"

কামাখ্যা তটস্থ হয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমি চোর নই।"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলল, "নন"? কী আশ্চর্য! ননই বা কেন? চুরির অনেক সুবিধে আছে মশাই। বুদ্ধিতে শান পড়ে, শরীরটা বেশ টগবগে থাকে,

চারদিকে নজর রাখার অভ্যেস হয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলেও কী যেন একটা কথা আছে, সেটাও নাকি খুব বেড়ে যায়। কথাটার মানে জানেন?"

কামাখ্যা দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না।"

"আমিও জানি না। ভাল কথাই হবে। তা হলে আপনি চোর নন?"

"আজ্ঞে না। ছোটখাটো একটু ব্যাবসামতো আছে।"

"চোর হলে বড় ভাল হত মশাই। চোরেরা গায়ের হালহদিশ সব জানে কিনা! তাদের কাছে অনেক গুহ্য খবর পাওয়া যায়।"

কামাখ্যা ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে বলল, "যে আজ্ঞে! চোরডাকাতও কিছু খারাপ নয়। অনেক কাজে লাগে। তা কোন গুহ্য খবর জানতে চাইছেন আজ্ঞে ?"

"সেটা কি ফস করে বলে ফেলা ঠিক হবে? পাঁচকান হয়ে গেলে গুহ্য কথা কি আর গুহ্য কথা থাকে?"

"তা অবিশ্যি ঠিক। তবে গাঁ-গঞ্জ জায়গা তো, কোনও কথাই তেমন ঢাকা-চাপা থাকে না। চাউর হয়ে পড়ে।"

চাপা গলাতেই কথা হচ্ছে, তবু লোকটা গলা আরও এক পরদা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আচ্ছা, এই অঞ্চলে কি কোনও লাশের খবর আছে?"

কামাখ্যা চাপা গলায় বলল, "তা আর নেই! তা খবরের জন্য লাশপ্রতি কত করে দিচ্ছেন?"

"আপনাদের এখানে রেট কত?"

"তা ধরুন, একশো টাকা তো হবেই।"

"দুর মশাই! আমাদের ওদিকে একশো টাকায় দশটা লাশের খবর পাওয়া যায়। দরাদরি করলে বারোটা তেরোটা অবধি।"

"আচ্ছা, না হয় পাঁচ-দশ টাকা কমই দেবেন।"

বেঁটে লোকটা মাথা নেড়ে ভারী দুঃখের গলায় বলল, "নাঃ, এখানে দেখছি দর বড্ড চড়া! তার উপর লাশ যদি বাবু বিশ্বাসের না হয়, তা হলে তো টাকাটাই জলে!"

কামাখ্যা আর-একটু গলা নামিয়ে বলল, "বাবু বিশ্বাসটা কে মশাই?"

"আছে মশাই আছে। বাবু বিশ্বাসের জন্য দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, সোজা ব্যাপার নয়। বাবু বিশ্বাসের লাশের খবর জায়গামতো পৌছে দিলে লাখ টাকা নগদ। হাতে-হাতে।"

কথাটা শুনে কামাখ্যার মুখ রসস্থ হয়ে পড়ল। টাকাপয়সার কথায় তার ওরকমধারা হয়। হেঃ হেঃ করে বলল, "তা খবরটা কাকে পৌছে দিতে হবে মশাই?"

"সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন। নইলে রাতবিরেতে বিছানার আরাম ছেড়ে এই আঁদাড়পাদাড়ে আমিই বা ঘুরে মরছি কেন, আর ওই ষন্ডা দুটোই বা কেন ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে? পাকা খবরের জন্য আমাদের মতো আরও কতজনা মাঠে নেমে পড়েছে কে জানে!"

"ওই ষন্ডাদুটো কি তবে বাটু পরিহারের লোক নয়?"

"বাটু পরিহার! সে আবার কে মশাই?"

"আজ্ঞে, বাটু পরিহারের লোকেরাই তো খুনটা করল!"

"কোন খুনটা?"

কামাখ্যা মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, ও কিছু নয়। কী বলতে কী বলে ফেলেছি!"

"ওটাই তো ভুল করেন। গুহ্য কথা বেভুলে যাকে তাকে বলে ফেলতে নেই মশাই। আর-একটু হলেই তো পেটের কথাটা বের করে ফেলতেন ! যাকগে, শেষ অবধি যে সামলে নিতে পেরেছেন, সেটাই বাঁচোয়া। তবে এ কথাও বলে রাখছি, খুনটা যদি নিজের চোখে দেখে থাকেন, আর লাশটা যদি বাবু বিশ্বাসেরই হয়, তা হলে তো কেল্লা মেরেই দিয়েছেন!"

"তা তো বুঝলুম। কিন্তু আপনি তো কেবল সাঁটে বলে যাচ্ছেন। ও থেকে জট ছাড়িয়ে আসল কথাটা বের করার কি উপায় আছে? লাখ টাকা যদি হাওয়ার নাড়ু হয়েই থেকে যায় তবে আর লাভ কী?"

একটা চলতি নিয়ম আছে। দোকানে গিয়ে পাঁচটা টাকা ফেলুন, এক পলা তেল পাবেন, কালীর থানে গিয়ে একটা টাকা প্রণামী খয়রাত করুন, পুরুত দুখানা বাতাসা দেবে। গোরুকে ঠিকমতো জাবনা দিন, দেখবেন হুড়হুড় করে দুধ নামবে। নিয়মটা হল, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। লাখ টাকার ঠিকানা আদায় করতে হলে খুনের গুহ্য কথাটা আগে উগরে দিন।"

কামাখ্যা আমতা-আমতা করে বলল, "পাচকান হলে যে আমার বড় বিপদ হবে মশাই!"

"আহা, বিপদ কি আপনার এখনই কম যাচ্ছে মশাই! ওই যে ষন্ডাদুটোকে দেখছেন, ওরা কার লোক জানেন?"

"আজ্ঞে না। কার?"

"থাক, সে আপনার জেনে কাজ নেই। শুনে যদি এক্ষুনি আপনার দাঁতকপাটি লেগে চোখ উলটে যায়, তা হলে বিপদ আরও বাড়বে। তার চেয়ে, উদগার তুললে যেমন পেটের বায়ু বেরিয়ে গিয়ে আরাম হয়, তেমনই গুহ্য কথাটা উগরে দিন, দেখবেন ভয়টা একটু কমে যাবে।"

"আজ্ঞে, খুনটা হল আজ দুপুরে, পাশের চৈতন্যপুর গায়ে, বিদ্যাধরীর ধারে। তবে যে খুন হল সে বাবু বিশ্বাস কিনা তা জানি না! বেশ ফরসাপান বাবুগোছের চেহারা, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, দাঁড়িগোফ আছে।"

লোকটা চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, "শাবাশ! লাখ টাকা এখন আপনার ট্যাকে, ওই হল বাবু বিশ্বাস।"

"বলেন কী মশাই?"

"ঠিকই বলছি।"

"তা মশাই, টাকাটা কী করে পাব?"

"শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতেন, তখনকার কথা মনে আছে? সরু, ছুরির ধারের মতো পথ, তাতে জল-কাদায় পিছল, তার উপর বিষধর সাপ কিলবিল করছে, তায় দুর্যোগ, তার উপর কাঁটাঝোপ, আরও কত কী! টাকাটা পেতে হলে এরকমই সব বিপদআপদ অগ্রাহ্য করে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। প্রাণ হাতে করে যাওয়া।"

"কেন মশাই, প্রাণ হাতে করে যেতে হবে কেন?"

"সে আপনার জেনে কাজ নেই। হার্ট ফেল হয়ে যেতে পারে। তবে লাখ টাকার জন্য ওটুকু বিপদ যদি গায়ে না মাখেন, তা হলে আর ভাবনা কীসের?"

কামাখ্যা ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "কথাটা আদায় করে নিয়ে এখন ছোলাগাছি দেখাচ্ছেন?"

"আরে, না! কথা আর আদায় হল কোথায়? শোনা কথার উপর লাখ টাকা ফেলার মতো আহাম্মক কি কেউ আছে? লাশই যদি না পাওয়া যায় তা হলে আর ও খবরের দামই বা কী বলুন ! যে টাকা দেবে সে কি খবরের সত্যাসত্য যাচাই করতে ছাড়বে? বাবু বিশ্বাসের লাশ খুঁজতেই তো আমরা ঘুরে মরছি। তা লাশটা এখন কোথায়?"

"খুনের পর যদি লাশ বিদ্যাধরীতে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে?"

"তা হলে লাখ টাকাও যে ভেসে গেছে মশাই! বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। লাশটা আঁকড়ে ধরে সেঁটে বসে থাকতে পারতেন। তা হলে লাখ টাকা লাট খেয়ে আপনার পায়ের গোড়ায় এসে পড়ত। যান, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুনগে, ষন্ডা দুটো চলে যাচ্ছে। আমাকে এক্ষুনি ওদের পিছু নিতে হবে।" বলেই লোকটা টপ করে উঠে গুড়ি মেরে উঠোনটা পার হয়ে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে মশা আর ডাঁশের কামড়ে জেরবার কামাখ্যা তিতকুটে মুখ নিয়ে উঠল। ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে জানালা দিয়ে লোকগুলোর গতিবিধি নজর করতে গিয়ে তার একগাল মাছি। উঠোনের পশ্চিমের শুড়ি পথটায় জ্যোৎস্নার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল, ষন্ডা দুটো হেলেদুলে যাচ্ছে। পিছন থেকে বেঁটে লোকটা দৌড়ে গিয়ে তাদের সঙ্গ ধরে ফেলল। তারপর তিনজনে নিচু গলায় কথা কইতে-কইতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে। কামাখ্যা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না বটে, কিন্তু মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেল। নড়বড়ে চৌকিটায় শুয়ে এ পাশ ওপাশ করতে-করতে রাত প্রায় কাবার। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ বাইরে হাকডাক শোনা গেল, "বগলাঠাকুর আছেন নাকি! ও বগলাঠাকুর!"

কামাখ্যা উঠে দরজাটা খুলেই বাজপড়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কাহরণ একগাল হেসে বলল, "কামাখ্যাবাবু যে!"

পাশ থেকে বিপদভঞ্জন বলে উঠল, "বৃন্দাবনবাবুও হতে পারেন!"

"তা বটে!"

"কামাখ্যাবাবু কি আমাদের চিনতে পারছেন না নাকি রে শঙ্কু?"

"মানুষ চেনা কি অত সোজা রে! তবে মনে হয় চিনেও চিনতে চাইছেন না।"

দুজনের এইসব কথাবার্তা কামাখ্যাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, কানেও ঢুকছিল না। সে দূরাগত একটা দুন্দুভির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। নরকের বাদ্যি-বাজনা কেমন হয় তা সে জানে না বটে, কিন্তু এই দুন্দুভির শব্দটা যে সেখান থেকেই আসছে, তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। যে বিশাল হাঁড়িতে পাপীদের সেদ্ধ করা

হয়, তার অাঁচও শরীরে আগাম টের পাচ্ছিল সে। এই সকালের আলোতেও সে চারদিকে আবছা-আবছা প্রেতের নৃত্য দেখতে পাচ্ছে। নদীর দিকটা ডুমুর গাছটার তলায় বিশাল চেহারার যমদূতকেও যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। বিশাল হোঁতকা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা, গায়ে লাল জামা, মাথায় লাল পাগড়ির মতো কিছু, হাতে মুগুরটুগুর আছে বলেই মনে হল। তার শমন সুতরাং এসেই গেছে। আর এটা বুঝতে পেরেই হঠাৎ কামাখ্যার সব ভয়ডর উবে গেল।

সে বেশ বুক চিতিয়ে অকম্পিত গলাতেই বলল, "এসে গেছ বাবারা ! তা তোমাদের যন্ত্রপাতি সব কোথায়?"

শঙ্কা আর বিপদ অবাক হয়ে একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল। তারপর শঙ্কাহরণ বলল, "যন্ত্রপাতি! কীসের যন্ত্রপাতি মশাই? আমরা কি মিস্তিরি নাকি?"

কামাখ্যা বলল, "আহা, মানুষ মারতে তো ছুরিছোরা, বন্দুকপিস্তল গোছের কিছু লাগে নাকি? গলা টিপেও মারা যায় বটে! কাল যেমন মারলে! আমার অবশ্য কোনওটাতেই আপত্তি নেই।"

শঙ্কা আর বিপদ নিজেদের মধ্যে আরও একবার তাকাতাকি করে নিল। তারা অবাক হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে গিয়ে শঙ্কাহরণ বলল, "তা আপনার পছন্দ কোনটা? ছুরিছোরা, নাকি পিস্তল-বন্দুক, নাকি..?"

"সব চলবে বাবারা, সব চলবে। তবে কিনা গুলিটুলি হলে মন্দ হত না। ব্যাপারটা চট করে হয়ে যেত। আগেই বলে রাখছি বাপু, বাবু বিশ্বাসের লাশের কিন্তু এখন লাখ টাকা দাম। সেই লাশের সন্ধানে বিস্তর লোক এসে গেছে। একটা বেঁটে লোক, দু-দুটো মুশকো জোয়ান। লাশ হাতছাড়া করলে কিন্তু পস্তাবে, এই বলে রাখলাম। এইবার চটপট কাজ সেরে ফ্যালো।"

শঙ্কাহরণ মাথা চুলকে বলল, "আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই বাবু বিশ্বাসটা কে বলুন তো?"

"কে জানে বাপু, তবে তার লাশের দাম লাখ টাকা। কাজটা সেরে বরং তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবু বিশ্বাসের লাশ পাহারা দাও গে। আর বাটু পরিহারকে গিয়ে বোলো, এই যে সে এবেলা-ওবেলা মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে এটা তার ভারী অন্যায়। এখন আর আমার ভয় কীসের, তাই উচিত কথাটাই বলছি। বাটু অতি খারাপ লোক। কথাটা বেশ চোটপাট করে পরিহারের পো'কে বলে দিয়ো তো! এবার চালাও গুলি, বসিয়ে দাও ছোরা..."

"হচ্ছে, হচ্ছে! অত হুড়ো দিচ্ছেন কেন বলুন তো! আপনি মরার আগে যে কয়েকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনি তো গিয়ে দিব্যি নরক গুলজার করে বসে যাবেন, কিন্তু ইদিকে যে কিছু ফ্যাকড়া থেকে গেল, তার কী হবে?"

"কীসের ফ্যাকড়া?"

"বেঁটে লোকটা কে?"

কামাখ্যা ধরা গলায় বলল, "আগে বেঁটে লোকদের আমি খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতাম হে। শুনেছিলাম, বেঁটে মানুষরা নাকি বেজায় বুদ্ধিমান হয়! কথাটা

মিথ্যেও নয়। লাখ টাকার প্যাঁচে ফেলে পেটের কথা বের করে নিল, একটা পয়সাও ঠেকাল না। না বাপু, কোনও বেঁটে লোককে আমি আর চিনতে চাই না। ঢের হয়েছে। তা বাপু, আর দেরি কেন? যে কাজে এসেছ, সেটি তাড়াতাড়ি সেরে সরে পড়ো। আমি মন তৈরি করে নিয়েছি। এই চোখ বুজলাম!"

শঙ্কাহরণ মোলায়েম গলায় বলল, "আপনাকে মারলে যে বদনাম হয়ে যাবে কামাখ্যাবাবু! বাটু পরিহারের বড় উঁচু নজর। মারলে হয়তো বলবেন, একটা শুটকো লোককে মেরে নাম খারাপ করলি কুলাঙ্গার! ছুঁচো মেরে যখন হাত গন্ধই করেছিস তখন বিদেয় হয়ে যা।"

কামাখ্যা চটে উঠে বলল, "এঃ, বাটু পরিহার কোথাকার খাঞ্জা খাঁ হে, যে আমাকে মারলে তার ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ হবে? খুব তো রোয়াব দেখছি তার! দু-চারটে লাশ নামিয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? তাকে বলে দিয়ো যে, কামাখ্যাচরণ তাকে মোটেই রেয়াত করে না। ঢের-টের বাটু পরিহার আমার দেখা আছে!"

"আজ্ঞে। তা সেই কথাটাই গিয়ে তা হলে বাটু পরিহারমশাইয়ের শ্রীচরণে নিবেদন করি। আজ্ঞা করুন, বিদেয় হই।"

কামাখ্যা বলল, "তা হলে তোমরা চললে!"

"যে আজ্ঞে।" মওকাটা ফসকালে হে! এমন মওকা আর পাবে না। সাক্ষীসাবুদ নেই, বাঁধাবিপত্তি নেই, নিরিবিলিতে দিব্যি আমার লাশটা নামিয়ে যেতে পারতে। তা কী আর করা!

|| ছয় ||

ভূতের মতো এমন গোলমেলে জিনিস আর দুটো হয় না। এই আছে, তো এই নেই। সাপটে ধরার জো নেই, ভাল করে নিরিখ-পরখ করার উপায় নেই, তেমন কাজেও লাগে না। তবে ভূতের সুবিধের দিক হল, থাক বা না থাক, তাদের অনেকেই ভয় খায়। এই ভয়খাওয়াদের মধ্যে কিছু-কিছু নাস্তিকও আছে, যারা ভূতকে মোটেই বিশ্বাস করে না। কিন্তু কিছু তে-এটে নাস্তিক আছে, যারা ভূতকে বিশ্বাসও করে না, ভয়ও খায় না। মুকুন্দ রায় এরকমই একজন নাস্তিক। সে যখন মারা গেল তখন শরীর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রথমে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর হাই তুলল, আর তার পরই দেখতে পেল, তার সামনে নিশাপতি দাঁড়িয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। মুকুন্দ রায় বিরক্ত হয়ে বলল, "আ মোলো, অমন বোকার মতো হাসছ কেন? হলটা কী?"

"এবার ভায়া? চিরকাল তো ভূত নেই, ভগবান নেই বলে বুক বাজিয়ে তর্ক করে গেলে! এবার বিশ্বাস হল তো!"

"কী বিশ্বাস হবে?"

"কেন, ভূত!"

"কেন, ভূতে বিশ্বাস করতে যাব কেন? আমার কি ভীমরতি হয়েছে?"

নিশাপতি চোখ কপালে তুলে বলল, "বলো কী হে! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? এই যে আমি ভূত, এই যে তুমি ভূত, টের পাছ না নাকি?"

মুকুন্দ রায় গরম হয়ে বলল, "যুক্তি আর বিজ্ঞান ছাড়া আমি কিছু বিশ্বাস করি না জানোই তো!"

"আমরা যে ভূত, এটা তো মানবে! নইলে মরার পরও আমরা আছি কী করে?"

"সেটা ভাবতে হবে। এটা হয়তো ভুল দেখা এবং ভুল বোঝার ব্যাপার। ভূতটুত কিছু নেই হে। ওসব কুসংস্কার!"

নিশাপতি গিয়ে জনাদশেক ভূতকে ডেকে আনল। তাদের মধ্যে লতা, যোগেন পালোয়ান, বাচস্পতিমশাই, নন্দদুলাল হাতি, বিস্তর চেনামুখ। সবাই নানাভাবে মুকুন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, মুকুন্দ হেরে গিয়েছে এবং এবার তার ভূতে বিশ্বাস করা উচিত। মুকুন্দ সমান তেজে সকলের সঙ্গে লড়ে গেল এবং বিস্তর বিখ্যাত মানুষের কোটেশন ঝেড়ে প্রায় প্রমাণ করেই ছাড়ল যে, ভূত বলে কিছু থাকতেই পারে না, ওটা অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

সেই থেকে মুকুন্দ একটু একা হয়ে আছে। কারও সঙ্গে বিশেষ মেশেটেসে না। বসে-বসে কেবল ভাবে, কখনও একটুআধটু পায়চারি করে।

কাল রাতে বগলাপতির মনটা ভারী প্রসন্ন ছিল। হবে না-ই বা কেন। পকেটে নগদ কড়কড়ে হাজার টাকা। তিনি বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে লালমোহনবাবুকে জীবনের অনিত্যতার কথা বোঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন, "বুঝলে লালুভায়া, গীতায়

আছে, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, মানে তো নিশ্চয়ই জানো, মরার পর বাসি ছেড়া কাপড় ফেলে দিতে হয়।”

লালমোহনবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, “সেটা কি ঠিক হবে বগলাদা? ছেড়া কাপড় দিয়ে তো আমার গিন্নি দিব্যি কাঁথা সেলাই করেন, পিদিমের সলতে পাকান, ঘর মোছার ন্যাত করেন। তারপর
ধরুন, পাঁচখানা পুরনো কাপড়ের বদলে ফিরিওলার কাছে একখানা বড় স্টিলের বাটি পাওয়া যায়।”

“বলো কী? আমার গিন্নি তো ভারী বোকা দেখছি! তিনি তো সেদিন সাতখানা পুরনো কাপড় দিয়ে স্টিলের বাটি নিয়েছেন।”

“তাই তো বলছি, বইয়ে-কেতাবে ভাল-ভাল কথা লেখা থাকে বটে, কিন্তু ওসব ধরতে নেই। তারপর ধরুন, মরার পরও কি জামাকাপড় লাগে না? নইলে লজ্জা নিবারণ হবে কী করে বলুন!”

“না হে, মরার পর আর জামাকাপড়ের বালাই নেই। বায়ুভূত অবস্থা তো, জামাকাপড় পরার উপায়ও থাকে না কিনা!”

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “কথাটা ঠিক হল না দাদা। এই তো গত মঙ্গলবার ভরসন্ধেবেলা নদীর ধারে বাচস্পতিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। হালে গত হয়েছেন। কদিন আগেই আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করলাম। দিব্যি হেঁটো ধুতি আর ফতুয়া পরে আছেন। নিজের চোখে দেখা।”

“ঠিক দেখেছ?”

“আজ্ঞে, একেবারে স্পষ্ট দেখা।”

“ইয়ে, তা তোমার ভূতের ভয়টয় নেই বুঝি ?”

“তা থাকবে না কেন? খুব আছে। ওই যে দেখুন না, ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুকুন্দ রায় বসে আছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে, আমি ভূতকে বড় ভয় পাই।”

বগলাপতি থমকে দাঁড়িয়ে ঠাহর করে দেখলেন, বটগাছের তলায় একটা লোক বসে আছে বটে। আমতা-আমতা করে বললেন, “তা ওটা মুকুন্দ রায়ের ভূত তোমাকে কে বলল? কেউ হয়তো ফাঁকায় এসে বসেছে হাওয়া খেতে।”

“মুকুন্দ রায়কে আমি বিলক্ষণ চিনি যে! ওইটেই ওঁর ঠেক।”

বগলাপতি দোনোমোনো করে বললেন, “দুর! ভূত নিয়ে কারবার করে বুড়ো হতে চললুম, আমি কি ভূত চিনি না!”

মুকুন্দ রায় হঠাৎ উঠে ফটফটে চাঁদের আলোয় এগিয়ে এসে ভারী বিরক্তির গলায় বলল, “কে রে, তখন থেকে ভূত-ভূত করছিস ! আরে! ওটা সেই চিটিংবাজ বগলা না!”

বগলাপতি একটা আঁক শব্দ করে চোখ উলটে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন।

মুকুন্দ রায় অসন্তোষের গলায় বলল,“ভুতে বিশ্বাস করিস নাকি তোরা? ছিঃ ছিঃ! এই বিজ্ঞানের যুগে ওই সব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছিস! ভূতটুত কিছু নেই! বুঝেছিস! তোদের জন্যই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।”

লালমোহনবাবু এতক্ষণ কিছু বলেননি, কিন্তু এ কথায় ভারী চটে উঠে বললেন, “এ আপনার কীরকম ব্যবহার মুকুন্দদা? এ তো ভারী অন্যায়! আপনি ভূত মানেন না, বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমরা যারা ভূতটুত মানি, তাদের উপর চড়াও হওয়া কি আপনার উচিত?”

মুকুন্দ রায়ও সমান তেজে গলা চড়িয়ে বলল, “আলবাত উচিত। লোকের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়াটা আমার পবিত্র কর্তব্য। যারা বলে যে ভূত দেখেছে, তারা হয় ভুল দেখেছে, নইলে মিথ্যে কথা বলে। খুব যে বড়-বড় কথা কইছিস, দেখাতে পারবি আমাকে ভূত? দেখাতে পারলে বুঝব তোর মুরোদ।”

অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে লালমোহনবাবু বললেন, “চোখ থাকতেও যে দেখতে পায় না তাকে ভূত দেখিয়ে আমার কাজ নেই। আপনি দেহ রেখেছেন, তাও বছর ঘুরতে চলল। এত দিনেও যদি ভূত না দেখে থাকেন তা হলে আর আমার বলার কিছু নেই।”

মুকুন্দ রায় চোখ পাকিয়ে বলল, “মুখ সামলে! ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!”

লালমোহনবাবু মিইয়ে গিয়ে বললেন, “না, এই বলছিলাম কী, আপনার স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের বউদি যে বছরটাক ধরে বৈধব্য পালন করছেন সেটা খেয়াল রাখবেন তো ! ছেলেরা ঘটা করে আপনার শ্রাদ্ধ-শান্তি করেছে, আমরা কবজি ডুবিয়ে খেয়ে এসেছি, সেটাও তো মিথ্যে নয়!”

মুকুন্দ রায় গম্ভীর গলায় বলল, “আমি বৈধব্যের ঘোর বিরোধী। তবু যদি কেউ সাধ করে বিধবা হয়, আমি কী করতে পারি? আর শ্রাদ্ধ-শান্তি তো কুসংস্কার, অনর্থক পয়সার অপচয়, পুরোহিততন্ত্রের হাত শক্ত করা। ওসব আগড়ম-বাগড়ম বকে কোনও লাভ নেই। ওই চিটিংবাজটা তোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে।”

লালমোহনবাবু আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলেন না। ধুতির খুঁট দিয়ে বগলাপতির মাথায় হাওয়া দিতে-দিতে শুধু বললেন, “যে আজ্ঞে। তবে কিনা, সব জিনিসেরই তো একটা নিয়ম আছে দাদা। মরার পরেও জ্যান্ত থাকাটা কি ভাল দেখায়?”

মুকুন্দ রায় চোখ পাকিয়ে বলল, “চোপ রও বেয়াদব! আমাকে বাঁচা-মরা শেখাতে এসেছে!”

ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত এবং বিক্ষুব্ধ মুকুন্দ রায় লাফ মেরে বটগাছের একখানা খুব উঁচু ডালে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল, “নাঃ, এ দেশটার কিছু হবে না। কোথায় গেল এদের যুক্তিবোধ, কোথায় গেল বিজ্ঞানমনস্কতা, কোথায় গেল কমন সেন্স! রাজ্যের কুসংস্কার, অজ্ঞানতা আর অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে আছে সব। বলে কিনা ভূত! কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না!”

পরদিন সকালে বগলাপতি কাহিল মুখে বাইরের ঘরে সাধনচৌকিতে বসে ছিলেন। মুখচোখে থমথমে ভাব, চোখে এখনও আতঙ্ক কাল রাতে জ্ঞান ফিরে আসার পর লালমোহনের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছেন। সারা রাত আতঙ্কে ভাল করে ঘুম হয়নি। সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি, খাওয়ায় রুচি নেই, পুজোপাঠটাও ভাল করে করা হয়নি, বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছেন।

এমন সময় দুটি লোক এসে গুটিগুটি সামনে দাঁড়াল। মুখে গ্যালগ্যালে হাসি। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "বগলাঠাকুর, একবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যেতে হবে যে! গিন্নিমা খবর পাঠিয়েছেন।"

"কেন রে?"

"আজ্ঞে, ঝাড়ফুকের ব্যাপার আছে!"

বগলাপতি সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, "ওরে না, না। বুজরুকি আমি ছেড়ে দিয়েছি ও পথে আর নয়। যা জমিজমা আছে তাইতেই চাষবাস করে চালিয়ে নেব। ওসব ঝাড়ফুক-টাড়ফুক স্রেফ চিটিংবাজি। ওসব ছেড়ে দিয়েছি রে!"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, আপনি ওসব ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কীসে? বুজরুকি ছাড়া কি আমাদের চলে?"

বগলাপতি মাথা নাড়া থামাননি। সেটাই চালিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "না রে, না, ওসব আর আমাকে বলিসনি। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।"

"কিন্তু বগলাঠাকুর, বুজরুকিতে যে মাঝে-মাঝে কাজ হয়। আপনার ঝাড়ফুক, জলপড়ায় বেশির ভাগ রুগিই ভাল হয় না বটে, কিন্তু মাঝেমধ্যে এক-আধটা তো দিব্যি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেও পড়ে!"

"হ্যাঁ রে, তোরা তৃতীয় নয়ন বুঝিস?"

"আজ্ঞে, তিন নম্বর চোখ তো!"

"হ্যাঁ। আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে রে। সারা জীবন যত অপকর্ম করেছি, সব দেখতে পাচ্ছি। তোরা যা বাপু, আমাকে এখন এক-একা বসে ভাবতে দে। আমি রোগটোগ সারাতে পারি না, আমার কোনও পোষা ভূত নেই, আমি মারণ-উচাটন-বশীকরণ জানি না। এত দিন ভাওতাবাজি করে লোক ঠকিয়ে খেয়েছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"সে আর নতুন কথা কী? আপনি যে ভাওতাবাজ, ভণ্ড, চিটিংবাজ, এ তো সবাই জানে। হাটে-বাজারে বলাবলিও হয়। তা বলে কি বিপদে পড়লে লোকে আপনার কাছে এসে ধরনা দেয় না? আপনি জালি, দু'নম্বরি হলেও বিপদে-আপদে লোকে তো আপনার উপরেই ভরসা করে, নাকি? সেটা কি কিছু কম কথা?"

হাপুস নয়নে, মুখে হতাশার ছাই মেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বগলাপতি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরা গলায় বললেন, "লোকে ওসব বলে বুঝি। বেশ করে, এবার থেকে আমিও সবাইকে বলে বেড়াব যে, বগলাপতি একটা ভন্ড, চিটিংবাজ, জোচ্চোর, ভাওতাবাজ. আর কী বাকি রইল রে?"

"আজ্ঞে, ওতেই হবে। কিন্তু এবার যে গা না তুললেই নয়, বগলাঠাকুর। গিন্নিমা যে আপনার আশায় বসে আছেন।"

"কার বাড়ি যাওয়ার কথা বললি যেন?"

"আজ্ঞে, আমাদের নমস্য করালীডাক্তার।"

বগলাপতি আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! তার চেয়ে কেউটে সাপের গর্তে হাত ঢোকাতে বল, খ্যাপা ষাঁড়ের সামনে লাল জামা পরে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে বল, বাঘের দুধ দুইয়ে আনতে বল, রাজি আছি। তবু করালীডাক্তারের চৌকাঠ ডিঙোতে পারব না রে বাপু।"

শঙ্কাহরণ গলা নামিয়ে বলল, "একটু ভেবে দেখুন কর্তা, বুজরুকি তো আর বারবার ফেল হতে পারে না। দশবারের মধ্যে হয়তো একবারই লেগে গেল। যদি লেগেই যায় তা হলে করালীকর্তাও আপনাকে দোবেলা সেলাম ঠুকবেন।"

বিপদভঞ্জন পাশ থেকে বলল, "করালীকর্তার আপনার উপর ভরসা নেই বটে, কিন্তু মা ঠাকরোনের আছে। তিনি বলেছেন, বগলাঠাকুরপো ছাড়া ওই ছোকরার ব্যামো কেউ সারাতে পারবে না।' ওষুধের কর্ম নয় মশাই। ভাল তেজিয়ান মন্তর ঝাড়লে কাজ হতে পারে। আর কাজ যদি হয় তা হলে চাই কী ? মা ঠাকরোন হয়তো আপনার কালীমন্দির বাবদ হাজার পাঁচেক টাকাই ফেলে দেবেন।"

"প্রাণ বড় না পাঁচ হাজার টাকা বড় রে?"

শঙ্কাহরণ ঘাড় চুলকে বলল, "এই তো ধন্দে ফেলে দিলেন। যদি সত্যি কথা বলতে হয় তো বলি, প্রাণের আর দাম কী? হালকাপলকা ফঙ্গবেনে জিনিস, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। তার চেয়ে পাঁচ হাজারের পাল্লা ঢের ভারী।"

বগলাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোরা একটা ছোকরার কথা বললি যেন!"

শঙ্কাহরণ বলল, "আজ্ঞে, ঠিকই শুনেছেন।"

"করালীর রুগি নাতি?"

"তা একরকম বলতে পারেন।"

"করালীর রুগি আমি সারাতে যাব এ কথা ভাবলি কী করে?"

"ভয় নেই মশাই, ডাক্তারবাবু এখন চেম্বারে। ঘণ্টা দুই নিশ্চিন্ত। পা চালিয়ে গেলে তিনি ফেরার আগেই কাজ সেরে ট্যাকে টাকা গুজে ফিরে আসতে পারবেন।"

বগলাপতি দোনোমোনো করে উঠলেন, বললেন, "কাজটা ঠিক হচ্ছে না রে। কাল রাতে মুকুন্দ রায় আমাকে চিটিংবাজ বলেছে। ভয়ে আর মনস্তাপে আমার

দাঁতকপাটি লেগেছিল। ভূতের কথা বিস্তর শুনেছি বটে, মুখোমুখি এই প্রথম দেখা, ধাক্কাটা সামলাতে পারিনি।"

"বলেন কী কর্তা! আপনার যে দুটি পোষা ভূতের কথা শুনি?"

"দুর দুর! ওসব মিথ্যে কথা। আমার কোনও ভূত নেই। জীবনে কোনও ভূতের সঙ্গে দেখাও হয়নি। কালই প্রথম দেখলাম। ওঃ, কী ভয়ংকর!"

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী। শঙ্কাহরণ হাসি সামলে বলল, "ভয়ংকরের কী আছে বগলাবাবা? ষষ্ঠীতলার মুকুন্দ রায়কে আমরা তো রাতবিরেতে প্রায়ই দেখি। নিশাপতি, যোগেন পালোয়ান, হালে বাচস্পতিঠাকুর— কাকে না দেখি বলুন। ওসব তো আমাদের গা-সওয়া। মুকুন্দকতাকে দেখে প্রথম দিন রাম নাম করে ফেলেছিলুম বলে পিলে-চমকানো ধমক ছেড়েছিলেন। রামটাম সব নাকি বুজরুকি। ভগবান- টগবান নাকি কেউ নেই। নাস্তিক মানুষ, বলতেই পারেন, তা বলে কি রাম নাম করব না মশাই? সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, রাম নাম করলে একটু যেন বল-ভরসা হয়, না কী বলেন?"

|| সাত ||

গোপাল গুছাইতের নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় বটে, কিন্তু দুঃখের কথা হল, অঘোরগঞ্জে গোরু থাকলেও বাঘের খুবই অনটন। ফলে ব্যাপারটা পরখ করে দেখা হয়নি কারও। তবে একথা ঠিক যে, দু-একজন ব্যাদড়া লোক ছাড়া এই গায়ে গোপালের কথার উপর কথা বলার হিম্মত কারও নেই। নিজেকে সে অঘোরগঞ্জের রবিন হুড বলেই মনে করে। তার চোখের দিকে চোখ রেখে কেউ কথা কয় না। সে রাস্তায় বেরোলে লোকজন সটাসট এদিকওদিক সটকে পড়ে।

এহেন গোপাল একটু মুশকিলে পড়েছে। ব্যাপারটা হল, পাশের হেতমপুর গাঁয়ে অপরেশ অপেরার 'বৈশাখী ঝড়' যাত্রা হচ্ছে, ফাটাফাটি নাটক। তিনটে সোর্ড ফাইট, গোটা চারেক ঝাড়পিট, বন্দুকের লড়াই এবং হেভি সব ডায়লগে সুপারহিট পালা। দলবল নিয়ে যাত্রা দেখে কাল গভীর রাতেই গাঁয়ে ফিরছিল গোপাল। যাত্রা দেখে তার রক্ত বেশ টগবগ করে ফুটছে। এসব পালা দেখলে গা গরম হয়, মাথা পরিষ্কার থাকে, গায়ে বেশ জোরও চলে আসে। অ্যাকশনে নেমে পড়তে ইচ্ছে হয়। গোপালেরও হচ্ছিল। ভগবান যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরে একটা অ্যাকশনের সুযোগ একেবারে প্লেটে করে সামনে সাজিয়ে দিলেন।

ইটখোলার মাঠটা পেরিয়ে গায়ে ঢুকবার মুখে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তারা দেখতে পেল, ষষ্ঠীতলার মোড়ে দুটো ষন্ডা চেহারার লোক একটা ছোটখাটো চেহারার লোককে রাস্তায় ফেলে বেদম পেটাচ্ছে, আর বলছে, "তুই ইচ্ছে করে আমাদের ভুল রাস্তায় ঘুরিয়ে মারছিস! আসল জিনিস কোথায় বল, নইলে খুন হয়ে যাবি!"

গোপাল এবং তার দলবলের মধ্যে তখনও 'বৈশাখী ঝড়' কাজ করছে। ভিতরকার সেই ঝড়ই একটা বাঘা গর্জন হয়ে গোপালের কণ্ঠ থেকে বেরোল, "কে রে তোরা? কার এত সাহস যে, এই গাঁয়ে এসে মস্তানি করে যায়?"

বলতে-বলতেই গোপাল আর তার দলবল ঝড়ের মতোই গিয়ে ষণ্ডাদুটোর উপর চড়াও হল। লালমোহনবাবু সেদিন বলছিলেন বটে যে, গোপালের পেটে চর্বি হয়েছে। তা গোপাল তারপর ব্যায়ামটায়াম করে চর্বি সারিয়ে ফেলেছে, হাতে-পায়ে বিদ্যুৎ খেলছে তার। তার সামনে কারওরই বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়, উচিতও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার প্রচণ্ড ঘুসিটা খুব শান্তভাবে এবং যেন খানিকটা বিনয়ের সঙ্গেই গ্রহণ করল প্রথম ষন্ডাটা। গোপালের অবশ্য ঘুসিটা মেরেই মনে হয়েছিল যে, সে ষন্ডাটার বদলে ভুল করে একটা গাছের গুড়িতেই ঘুসিটা মেরে বসেছে। কিন্তু কাছাকাছি কোনও গাছ না থাকায় ভারী অবাক হয়ে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর যে কী হয়েছিল তা গোপাল গুছাইত গুছিয়ে বলতে পারবে না। শেষ রাতে ঘুম ভাঙার

পর সে যেমন বুঝতে পারছিল না, বিছানার বদলে সে একটা মাঠে ঘুমিয়েছিল কেন!

চাঁদ ঢলে পড়লেও জ্যোৎস্না এখনও একটু আছে। গোপাল চারদিকে চেয়ে তার সামনেই একটা লোককে বসে থাকতে দেখতে পেল। লোকটা ছোটখাটো, মনে হল দাঁড়ি-গোফ আছে। কিন্তু রাতের বেলা লোকটা মাঠে বসে আছে কেন তা সে বুঝতে পারছিল না। তার মাথায় আর গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল বটে, কিন্তু গোপালের তার চেয়েও বড় সমস্যা হল, সে যে কে, সেটাও সে বুঝতে পারছিল না। তাই সে করুণ গলায় লোকটাকেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমি কে বলুন তো!"

লোকটা বিরস গলায় বলল, "এ তো লাখ টাকার প্রশ্ন মশাই, আমি কে— তা জানতে মানুষ কত সাধনা করেছে জানেন? আজও হায়-হয়রান হয়ে প্রশ্নের জবাব খুঁজে যাচ্ছে। তা আপনার কী মনে হয়?"

"মনে হচ্ছে প্রাণনাথ সেন কিংবা হরিপদ ঘোষ।"

"খারাপ নয় মশাই, মোটেই খারাপ নয়। আমার চেয়ে আপনার অবস্থা ঢের ভাল।"

"কেন বলুন তো?"

"আপনার তো মোটে দুটো নাম। আমার চৌষট্টিটা।"

"বলেন কী?"

"তা হবে না? যখন রাজপুত্র সাজি তখন এক নাম, যখন কাবুলিওলা সাজি তখন আর-এক নাম, যখন পুলিশ সাজতে হয় তখন ভিন্ন নাম, যখন কুলিকামারি বা রিকশাওলা সাজতে হয়, তখন ফের নতুন নাম। আর এই করতে গিয়েই তো সর্বনাশটা হল। চৌষট্টিটা নামের মধ্যে আমার আসল নামটাই গেল গুলিয়ে। এখন মাথায় ডাঙস মারলেও পিতৃদত্ত নামটা মনে পড়ে না মশাই।"

"বটে! কিন্তু ছদ্মবেশ ধরেন কেন?"

"না ধরে উপায় আছে? আমার বড় বিপদের কাজ মশাই! আমি হলুম গোয়েন্দা পোয়াবারো।"

"পোয়াবারো? কথাটা যেন কোথায় শুনেছি!"

"তা শুনে থাকবেন, তবে এটাও ছদ্মনাম।"

"আপনি তা হলে পুলিশের লোক?"

"কস্মিনকালেও নয়। পুলিশে ঢোকার বড় সাধ ছিল মশাই, সাইজের জন্য হল না। আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা।"

গোপাল খুব কষ্টে উঠে বসল, তারপর খানিকক্ষণ ঘাড় নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে মাথার ধোয়াশা কাটানোর চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু আমিই বা এখানে পড়ে আছি কেন, আর আপনিই বা এখানে বসে আছেন কেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "মরে থাকার চেয়ে পড়ে থাকা কি ঢের ভাল নয়?"

"ও কথা বলছেন কেন?"

"ঠিকই বলছি। চিরু আর শচির পাল্লায় পড়লে প্রাণ নিয়ে কম লোকই ফেরে।"

"তারা কারা?"

"তারা খুব মারকুট্টে লোক মশাই। পেশাদার খুনি।"

"তারা কি আপনাকে মেরেছে?"

"আপনাকেও কি ছেড়েছে নাকি?"

গোপাল ভারী অবাক হয়ে বলল, "আমাকেও মেরেছে?"

"তবে! মেরে নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।"

"এ তো ভারী অন্যায়!"

"অন্যায়! তা অন্যায় হলেও সব জিনিসেরই একটা ভাল দিকও তো আছে। আপনারা দলবল নিয়ে এসে চড়াও হওয়াতেই তো আমার প্রাণটা এ যাত্রা বেঁচে গেল! আর আপনাদের সুবিধের দিকটাও বিবেচনা করুন। অনেকজন থাকায় চিরু আর শচি কারও উপরেই সুবিচার করতে পারল না, মারটা ভাগাভাগি হয়ে গেল। আর এ তো সবাই জানে যে, কোনও জিনিস ভাগাভাগি হলে পরিমাণে কমে যায়।"

গোপাল সচকিত হয়ে বলল, "আমার দলবলও ছিল নাকি? তা তারা সব গেল কোথায় বলুন তো!"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "সকলের কথা জানি না। একজনকে দেখেছি শচির রদ খেয়ে ভুল বকতে-বকতে ওই মাঠধরে বোধ হয় বিবাগীই হয়ে গেল। আর-একজনকে চিরু হাঁটু দিয়ে মেরুদণ্ডে মারায় সে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে-কাঁদতে ওই ইটের পাঁজার পিছনে গিয়ে লটকে পড়েছে। একজন শচির চড় খেয়ে হঠাৎ গৌরাঙ্গের মতো দু'হাত তুলে মা, মা' বলে ডাকতে-ডাকতে মাকে খুঁজতে যে কোথায় চলে গেল কে জানে। চার নম্বর ছোকরা চড়চাপড় খেয়ে সেই যে দৌড়ে গিয়ে ওই ঝুপসি গাছটায় উঠে পড়েছিল আর নামেনি।"

"কিন্তু এসব হচ্ছে কেন মশাই?"

"হচ্ছে বাবু বিশ্বাসের জন্য।"

"বাবু বিশ্বাসটা কে?"

লোকটা ডাইনে-বায়ে মাথা নেড়ে বলল, "বললে বিশ্বাস হবে না। তবে সে একজন খসে পড়া মানুষ।"

"খসে পড়া মানুষ আবার কী মশাই?"

"শুনেছি, সে নাকি আকাশ থেকে খসে পড়েছিল।"

"আকাশে কি মানুষের গাছ আছে যে, খসে পড়বে?"

লোকটা উদাস গলায় বলল, "দুনিয়ায় কত কী হয়!"

গোপাল গুছাইত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই তেমন পরিষ্কার হল না তার কাছে। এমনকী সে প্রাণনাথ না

হরিপদ ঘোষ, সেটাও সাব্যস্ত হল না এখনও। তার মধ্যে এই পোয়াবারো, হিরু, শচি, বাবু বিশ্বাসরা ঢুকে মাথাটা আরও গণ্ডগোল করে দিচ্ছে।

গোপাল করুণ গলায় বলল, “না হয় ধরেই নিলাম, বাবু বিশ্বাস আকাশ থেকেই পড়েছে, কিন্তু সে পড়ার ফলে হলটা কী?”

পোয়াবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সে পড়ার পরই যে কালবোশেখির ঝড় শুরু হয়ে গেল!”

“কালবোশেখির ঝড়! কালবোশেখির ঝড়!” বিড়বিড় করতে-করতে হঠাৎ যেন মাথায় উপর্যুপরি বজ্রাঘাত হতে লাগল গোপালের। তাই তো! বৈশাখী ঝড়! কাল রাতে সে তো দলবল নিয়ে হেতমপুরের ‘বৈশাখী ঝড়’ যাত্রা দেখতে গিয়েছিল! সে তো মোটেই প্রাণনাথ সেন বা হরিপদ ঘোষ নয়! সে যে অঘোরগঞ্জের অবিসংবাদী রুস্তম, এক এবং অদ্বিতীয় রবিনহুড গোপাল গুছাইত! গোপাল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে গর্জন ছাড়ল, “আমি গোপাল! আমি যে গোপাল গুছাইত!”

পোয়াবারো বিরক্ত হয়ে বলল, “আহা, আবার নাম বাড়াচ্ছেন কেন? দুটো নাম নিয়েই দোটানায় পড়েছেন, আর-একটা নাম জুটলে যে হিমশিম খাবেন!”

গোপাল হুংকার দিয়ে উঠল, “কে বলল আমার তিনটে নাম? আমার একটাই নাম। গোপাল গুছাইত। এ নাম শুনলে অঘোরগঞ্জে সবাই কাঁপে।”

লোকটা চোখ পিটপিট করে বলল, “অ! তা হলে আপনি সত্যিই গোপাল গুছাইত! ভাগ্যবান লোক মশাই আপনি! আর আমার অবস্থা দেখুন। নকল দাঁড়ি-গোঁফ, নকল চুল, নকল পোশাক আর নকল নামের জঙ্গলে হারিয়ে বসে আছি। আমি যে আসলে কে তা আর আমিও বুঝতে পারি না।”

গোপাল ফুঁসতে-ফুঁসতে বাঘা গলায় ধমক দিয়ে বলল, “বকোয়াস বনধ করো। কে বা কারা আমার আর আমার স্যাঙাতদের গায়ে হাত তুলেছে? কার এত সাহস? কোথায় চিরু আর শচি?”

পোয়াবারো মোলায়েম গলায় বলল, “হবে-হবে। ঠান্ডা হয়ে বসুন তো! সব সময় হাকডাক আর গায়ের জোরে কাজ হয় না। তাতে বরং কাজ ফসকে যায়।”

গোপাল কিছুক্ষণ ফোঁস-ফোঁস করে তারপর ধপ করে বসে পড়ল। বলল, “রাগে যে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে!”

“তা জ্বলতেই পারে। আপনি একজন পালোয়ান লোক, পালোয়ানরা মারধর খেতে একদম পছন্দ করে না।”

গোপাল ফুঁসে উঠে বলল, “তারা আমাকে খুব মারধর করেছে নাকি? তা হলে তাদের আমি এমন শিক্ষা দেব যে...!”

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, “না মশাই, না। স্বচক্ষে দেখেছি, শচি আপনাকে মাত্র একটাই ঠোকনা মেরেছিল। আর তাইতেই— থাকগে, ওসব কথা আপনার শুনে আর কাজ নেই। বরং যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। কথাটা হচ্ছে, বাবু বিশ্বাসকে নিয়ে।”

"কী কথা?"

"আমি যত দূর জানি, বাবু বিশ্বাস এ গাঁয়েই কারও বাড়িতে ঘাপটি মেরে আছে। কিন্তু তার বড় বিপদ। চিরু আর শচি তাকে খুঁজছে। তাদের উপর হুকুম আছে, বাবু বিশ্বাসকে দেখামাত্র খুন করে তার ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে যেতে।"

"ঘড়ি। ঘড়ির জন্য কেউ খুন করে নাকি?"

"করে। মৃগাঙ্কবাবু করেন। নবিনগরে তার প্রাসাদোপম বাড়িতে যদি যান তা হলে ঘড়ি দেখে তাজ্জব হয়ে যাবেন। দুনিয়ায় হেন ঘড়ি তৈরি হয়নি যা তার

কালেকশনে নেই। গোল, চৌকো, তেকোনা, দুকোনা, আটকোনা, অ্যানালগ, ডিজিটাল, অ্যান-ডিজি-টেম্প, হিরে বসানো, মুক্তো বসানো হাজার হাজার ঘড়ি। ওইটেই মৃগাঙ্কবাবুর শখ। ঘড়ির এমন নেশা তার যে, দুষ্প্রাপ্য ঘড়ি হাতানোর জন্য তিনি এ পর্যন্ত গোটা চারেক খুনও করিয়েছেন। আমাকে তিনি মাইনে দিয়ে রেখেছেন কেন জানেন?”

“কেন?”

আমার কাজ হল তাকে নানারকম ঘড়ির সুলুকসন্ধান দেওয়া এবং ঘড়ি হাতাতে সাহায্য করা। বাবু বিশ্বাসের ঘড়িটাই হয়েছে তার কাল।”

“কেন, বাবু বিশ্বাসের ঘড়িটা কীরকম? খুব দামি নাকি?”

“দামি হলে তো কথাই ছিল না। দাম দিতে ঘড়ি-পাগল মৃগাঙ্গবাবু এক কথায় রাজি। যেগুলো দাম দিয়ে পাওয়া যায় না সেগুলোই বাকী পথে আদায় করতে হয়। ঘড়ির জন্য তিনি পাহারাদার রাখেন, গুন্ডা পোষেন, গোয়েন্দা বহাল করেন। ঘড়ির জন্য টাকা খরচ করতে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। বাবু বিশ্বাসের ঘড়িটার জন্য তিনি কত কবুল করেছিলেন জানেন? পঞ্চাশ লাখ টাকা!”

শুনে হা হয়ে গেল গোপাল। কিছুক্ষণ মুখে বাক্য সরল না। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, “পঞ্চাশ লাখেও দিল না? লোকটা তো বুরবক দেখছি!”

“দেওয়ার উপায় নেই মশাই। ঘড়ি দিলে বাবু বিশ্বাস বাড়ি ফিরবে কী করে?”

“তার মানে? ঘড়ির সঙ্গে বাড়ি ফেরার সম্পর্ক কী?”

“আছে মশাই আছে। ওই ঘড়ির সংকেত ধরেই তো তার বাড়ির লোক তাকে নিতে আসবে।”

“দুর মশাই! আপনি আমার মাথাটা ফের গুলিয়ে দিচ্ছেন।”

“মাথা গুলিয়ে যাওয়ারই কথা। আমারও গুলিয়ে গিয়েছিল কিনা!”

“সে তো আর কচি খোকা নয় যে, বাড়ির লোক নিতে না এলে যে বাড়ি ফিরতে পারবে না!”

“ভুল করছেন মশাই। মনে রাখবেন, বাবু বিশ্বাসের বাড়ি আকাশে। সে যে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল সেটা কি ভুলে গেলেন?”

“শুনে আমারও তো আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। একটু খোলসা করে বলবেন ব্যাপারটা আসলে কী? আকাশে কি কারও বাড়ি থাকতে পারে মশাই?”

“যা শুনেছি তাই বলছি।”

“কার কাছে শুনেছেন? বাবু বিশ্বাসের কাছে তো! সে গুল মেরেছে।”

লোকটা চোখ বড়-বড় করে ভারী অবাক হয়ে বলল, “গুল মারবে কী মশাই, সে তো মোটে কথাই বলতে পারে না।”

“মুক নাকি?”

“মৃগাঙ্কবাবু ডাক্তার ডাকিয়ে দেখিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছে, মূকও নয়, বধিরও নয়।”

“তা হলে কথা কয় না কেন?”

"এই তো সমস্যায় ফেলে দিলেন। বাবু বিশ্বাস কথা কয় না বটে, কিন্তু তার সামনে বসে যদি শান্ত মনে তার দিকে চেয়ে থাকেন, তা হলে অনেক কিছু টের পাবেন। তা কথার চেয়ে কিছু কম নয়।"

"আচ্ছা, সে যদি কথাই না কইবে তা হলে সে যে বাবু বিশ্বাস তা জানলেন কী করে?"

লোকটা একগাল হেসে বলল, "জানি না তো! ওটাও ছদ্মনাম। আসলে কাজ-চলা গোছের একটা নাম দেওয়ার দরকার হয়েছিল বলে মৃগাঙ্কবাবুই ওর নাম দেন বাবু বিশ্বাস। কিন্তু মশাই, আর দেরি করা কি ঠিক হবে? ভোর হয়ে আসছে। এতক্ষণে যদি খুনটা না হয়ে থাকে তবে আর দেরিও নেই। বাবু বিশ্বাসকে এখনই খুঁজে বের না করলেই নয়। সেটা চিরু আর শচির আগেই।"

গোপাল লাফিয়ে উঠে বলল, "চলুন তো, দেখি তাদের এলেম!"

|| আট ||

ঠাকুরঘরে বসে সুরবালা ফল কাটছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন ডাকল, "মা!"

সুরবালা চমকে উঠলেন, তার কোনও সন্তান নেই। মা বলে কেউ ডাকে না তো! তবে ভিখিরিটিকিরি বা কাজের মেয়েটেয়ে, এরা ডাকে। কিন্তু সে ডাক এরকম নয়। এ ডাকটা অন্যরকম। ভাবলেন ভুল শুনেছেন, কিংবা পাশের বাড়ির শব্দও হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে আবার স্পষ্ট মনে হল, কেউ ডাকছে, "মা।" এবার অবাক হয়ে বুঝতে পারলেন, শব্দটা তিনি কানে শোনেননি। ডাকটা তার ভিতরেই যেন সৃষ্টি হল! আশ্চর্য ব্যাপার তো! বাইরে থেকে কেউ ডাকছে না, কিন্তু ভিতরে ডাক তৈরি হচ্ছে, এ কেমন কথা! এরকম কি হয়? না মনের ভুল!

এবার স্পষ্ট টের পেলেন তার ভিতরে একটি ছেলের গলা বলে উঠল, "মা, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, আমি জানি। অবাক হবেন না।"

সুরবালা হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি কে বাবা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি রা।"

"রা! কী আশ্চর্য নাম! কিন্তু তুমি কোথা থেকে কথা বলছ বাবা?"

"আপনি আমার নাম দিয়েছেন ভোলানাথ।"

"ওঃ! তুমি ভোলানাথ! আমি এক্ষুনি তোমার কাছে আসছি বাবা! এক্ষুনি।"

সুরবালা আলুথালু হয়ে ছুটে এসে দেখলেন, ছেলেটা তেমনি শান্তভাবে শুয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিও ভারী ঠান্ডা। মুখে প্রশান্তি। তার ঠোঁট নড়ছে না। তবু সুরবালা তার নিজের ভিতরেই কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ভোলানাথ বলছে, "আমার বাড়ি অনেক দূরে। আকাশের অন্য প্রান্তে। আমি যে পৃথিবীতে থাকি সেখানে কেউ কথা বলে না, আমাদের কোনও ভাষা নেই, শব্দ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের কথার তরঙ্গ অন্যের কাছে পাঠাতে পারি। অন্যের তরঙ্গও বুঝতে পারি। অনেক দূরের লোকের সঙ্গেও আমরা এইভাবে কথা কই। কোনও ভাষার দরকার হয় না।"

"তুমি কি আমার কথা বুঝতে পার বাবা?"

"আমি আপনাদের ভাষা জানি না। কিন্তু সব স্পষ্ট বুঝতে পারি।"

"কী আশ্চর্য বাবা! আমি যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছি!"

"আপনি মনে-মনে কথা বললেও আমার বুঝতে কষ্ট হয় না।"

"আচ্ছা, তবে আমি মনে-মনেই বলি, 'তুমি কি এখন কিছু খাবে?

"না, আমার খিদে পায়নি।"

"বাবা ভোলানাথ, তোমার বোধ হয় জ্বরবিকার মতো হয়েছে। ভুল বকছ।"

"ও কথা কেন বলছেন?"

"এই যে বললে তুমি আকাশের কোথা থেকে এসেছ! আকাশ থেকে আসবে কেন বাবা ! ওকথা বলতে নেই। বরং গাঁয়ের নামটা মনে করার চেষ্টা করো।"

"আমার গায়ে কিন্তু জ্বর নেই।"

"তা বটে! গা তো এখন ঠান্ডা। তা হলে বোধ হয় মাথার চোটের জন্য কিছু মনে পড়ছে না। আমি বগলাপতি ঠাকুরপোকে খবর দিয়েছি। শুনেছি তার মন্তরে ভাল কাজ হয়।"

"কিন্তু আমি তো ভাল হয়ে গিয়েছি। আপনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনুন। তিনি ঠিকই বুঝবেন।"

"অত চোট কি এক রাতে ভাল হয় বাবা? একটু সময় তো লাগবেই।"

"তা হলে আমিই ডাক্তারবাবুকে ডাকছি।"

সুরবালা খুব ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। টেলিপ্যাথি বলে একটা ব্যাপার আছে তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু সেটা যে এরকম আশ্চর্য কাণ্ড, তা তার জানা ছিল না। একটু পরেই করালীডাক্তার বাইরের ঘরে রুগি দেখা ছেড়ে শশব্যস্তে এসে ঘরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো! আমার মনে হল, কে যেন এ ঘরে আমাকে ডাকছে।"

সুরবালা মুখ ব্যাজার করে বললেন, "ভুল শোনোনি। আজ সকাল থেকে ভুতুড়ে কাণ্ডটা হচ্ছে। ভোলানাথের মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোচ্ছে না, কিন্তু কী করে যেন আমি ওর সব কথা শুনতে পাচ্ছি। আমার মনের কথাও ভোলানাথ শুনতে পাচ্ছে। হ্যাঁ গা, এসব কী হচ্ছে?"

একটু আগে ভোলানাথ ওরফে রা সুরবালাকে যা যা বলেছিল এবার করালীডাক্তারও সেই কথাগুলো শুনতে পেলেন, "আমার বাড়ি অনেক দূরে। আকাশের অন্য প্রান্তে। আমি যে পৃথিবীতে থাকি, সেখানে কেউ কথা বলে না. করালীডাক্তার শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, ভোলানাথের ঠোঁট নড়ছে না। আর কথাগুলো তিনি কান দিয়ে শুনছেন না, তার ভিতরে যেন কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছে।

করালীডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। এবং বিশ্বাস করছি। আমাকে সব খুলে বলো।"

"খুলে বললেও আপনি বুঝতে পারবেন না।"

করালীডাক্তার একটা চেয়ার নিয়ে ভোলানাথের মুখোমুখি বসে বললেন, "বুঝবার চেষ্টা করতে দোষ কী? অত দূর থেকে তুমি কীভাবে এলে? মহাকাশযানে নাকি?"

"মহাকাশযান সেকেলে জিনিস। আমি এসেছি নলের ভিতর দিয়ে।"

"নল? সেটা কী জিনিস?"

"টিউবুলার সিস্টেম অফ স্পেস ট্র্যাভেল।"

"কী করে বোঝাব বলুন তো! ওই বিজ্ঞান তো আপনাদের জানা নেই। যদি বলি মনোরথ, তা হলে বুঝবেন?"

“মনোরথ তো কল্পনা।”

“সব কল্পনারই রূপ আছে। রূপায়ণও আছে।”

“ঠিক আছে। আবছাভাবে বুঝলাম। কিন্তু তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছিলে?”

“কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। একটা সবুজ প্রাণবান গ্রহ দেখে নেমে পড়েছিলাম।”

“তারপর?”

“বেচাকেনা কাকে বলে তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন!”

“জানব না কেন ?”

“আমি জানতাম না। আমি যেখানে থাকি সেই পৃথিবীতে বেচাকেনা বলে কিছু নেই। যার যখন যা প্রয়োজন তা সে পেয়ে যায়। এখানে টাকা-পয়সা বলেও একটা ব্যাপার আছে।”

“ভীষণভাবে আছে।”

“আমরা টাকা-পয়সার নামই শুনিনি।”

“কেনাকাটা না থাকলে টাকা-পয়সার প্রয়োজনই বা কী?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই। ফলে আমরা কেউ সঞ্চয় করি না। সোনাদানা আমাদের কাছে কোনও মূল্যবান জিনিস নয়। এক ধরনের ধাতু মাত্র, যা নানা কাজে লাগে। আমাদের দেশে গরিব বা বড়লোক বলেও কিছু হয় না। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে?”

“হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ বেচাকেনার কথা কেন?”

“আমি যেখানে এসে প্রথম নামি সেটা একটা বাগান। বেশ বড় দেওয়াল-ঘেরা বাগান। তাতে অনেক গাছপালা। তখন শেষ রাত্রি। আমি চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে সব লক্ষ করছিলাম। হঠাৎ দুটো প্রকাণ্ড কুকুর গাঁক-গাঁক করে আমার দিকে তেড়ে এল। পিছন-পিছন ছুটে এল কয়েকজন পাহারাদার।”

“কুকুরগুলো তোমাকে কামড়ায়নি তো!”

“কামড়েছিল। তবে আমার গায়ে একটা আবরণ থাকায় তারা দাঁত বসাতে পারেনি।”

“তারপর?”

“দরোয়ানরা আমাকে মৃগাঙ্কবাবুর কাছে নিয়ে যায়।”

“কোন মৃগাঙ্ক ? ঘড়িয়াল মৃগাঙ্ক নাকি?”

“হ্যাঁ।”

“সর্বনাশ ! সে যে ভীষণ খারাপ লোক?”

“খারাপ লোক কাকে বলে তা আমার জানা ছিল না। আমি এর আগে কোনও খারাপ লোক দেখিনি। তবে আমাদের দেশে কম মেধা এবং বেশি মেধার লোক আছে। খারাপ ভাল নেই।”

“বুঝেছি।”

"মৃগাঙ্কবাবু আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমার কথার তরঙ্গ তিনি ধরতে পারেননি। তিনি মনে করলেন আমি মুক এবং বধির।"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

"তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করতে লাগলেন এবং বারবারই তিনি আমার ঘড়িটা দেখতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে ঘড়িটার দাম জিজ্ঞেস করেন। দাম কাকে বলে তা জানা না থাকায় আমি তাকে কিছুই বলতে পারিনি। তিনি কয়েক বান্ডিল কাগজের টুকরো আমার কাছে নিয়ে এলেন।"

"হ্যাঁ, সেগুলোকে টাকা বলে।"

"হ্যাঁ, এখন আমি তা জানি। তিনি আমাকে একটা টাকাভর্তি মানিব্যাগ দিয়ে বললেন, আমি যেন ইচ্ছেমতো কেনাকাটা করি। কিন্তু কেনাকাটা কাকে বলে সে ধারণাই আমার ছিল না। তৃতীয় দিন তিনি ঘড়িটার জন্য একটু জোরজুলুম করতে থাকেন।"

"শুনেছি দুষ্প্রাপ্য ঘড়ির জন্য তিনি মানুষও খুন করতে পারেন।"

"আমিও শুনেছি আমাদের দেশে কয়েক হাজার বছর আগে যুদ্ধবিগ্রহ এবং খুনখারাপি হত। কিন্তু এখন তা ধুলোটে ইতিহাস। খুন তো দূরের কথা, কাউকে আঘাত করার কথাও কেউ ভাবতে পারে না। অস্ত্রশস্ত্র আমরা একমাত্র জাদুঘরে গেলে দেখতে পাই। তা ছাড়া অস্ত্র ব্যবহারের কোনও অবকাশ নেই। সেখানে কোনও অস্ত্র পাওয়াও যায় না। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু একটা অস্ত্র দিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন। আমি ভয় না পাওয়ায় উনি রেগে গিয়ে আমাকে ঘুসি মারেন। তাঁর লোকেরা আমার হাত থেকে ঘড়িটা জোর করে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এর স্ট্র্যাপটা একটা বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া খোলে না। তারা চেষ্টা করেও পারেনি।"

"কিন্তু ভোলানাথ, প্রাণের চেয়ে তো আর ঘড়িটার দাম বেশি নয়। তুমি ঘড়িটা দিয়ে দিলেই পারতে!"

"পারতাম। কিন্তু সেটা ভয়ংকর অবিমৃশ্যকারিতা হয়ে যেত। এই ঘড়িটার ঠিকঠাক ব্যবহার না হলে পৃথিবীতে প্রলয় হয়ে যেতে পারত।"

"তার মানে?"

"এই ঘড়ি আকাশে হঠাৎ ঝড়ের মেঘের সঞ্চার ঘটাতে পারে, সমুদ্রে বিপুল তরঙ্গ তুলতে পারে, এর ভিতর থেকে বস্তুকণা ছুটে গিয়ে যে-কোনও ধাতু বা পাথরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। এই জিনিস মৃগাঙ্কবাবুর হাতে পড়লে অঘটন ঘটতেই পারত।"

"তা বটে।"

"আরও একটা কথা আছে। এই ঘড়ি আমার কাছে না থাকলে দেশের লোকেরা আমার সন্ধান পাবে না। এই ঘড়ির সঙ্কেত ধরেই তারা একদিন আসবে।"

"এটা তাদের বুঝিয়ে বলেছ?"

"বলেছি! কেউ আমার কথা বুঝতে পারেনি। শুধু বেঁটে আর রোগা চেহারার একটা লোক একটু টের পেত। কিন্তু সে ভিতু মানুষ। বুঝেও আমাকে রক্ষা করতে পারেনি।"

"তোমার ঘড়িটার মধ্যে কি সত্যিই অত ক্ষমতা আছে?"

"দেখুন।" বলে ভোলানাথ তার বা হাতটা তুলে ডান হাত দিয়ে ঘড়ির এক পাশে সামান্য চাপ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র শিসের শব্দ তুলে কী একটা বস্তু ছুটে গিয়ে দরজার পাশের দেওয়ালটায় একটা প্রায় আধ ইঞ্চি ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

"সর্বনাশ! এ তো সাংঘাতিক জিনিস!"

"এটা কিন্তু অস্ত্র নয়। আমাদের কাজের যন্ত্র হিসেবেই এর ব্যবহার।"

"তারপর?"

"দশ দিনের দিন মৃগাঙ্কবাবু ধৈর্য হারিয়ে আমাকে আক্রমণ করলেন। প্রথমটায় তার দলবল আমাকে কিল-চড়-লাথি মারতে থাকে। আমি ভীষণ অবাক। মানুষের হাত-পা যে অন্যকে ব্যথা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়, তা আমার জানাই ছিল না।"

"তাই তুমি উলটে মারতে পারনি?"

"না। তবে আমার প্রাণশক্তি সাংঘাতিক। অত মার খেয়েও ভেঙে পড়িনি।"

"তা আমি জানি। তোমার মতো জোরালো হার্ট আর লাংস আমি কখনও দেখিনি। তোমার মাসল পাওয়ারও অবিশ্বাস্য। জলে বহুক্ষণ ডুবে থেকেও তোমার তেমন কিছুই হয়নি। প্রচণ্ড মার খেয়ে এবং পেটে গুলি লাগা সত্ত্বেও তোমার নাড়ি খুবই সবল স্বাভাবিক ছিল। তোমার ভাইটাল ফোর্স যে অসাধারণ তা আমি জানি। তুমি উলটে মারলে ওরা দাঁড়াতেই পারত না।"

"কী করব বলুন। আমি কখনও কাউকে মারিনি। কেউ আমাকে কখনও মারেনি। মারপিট ব্যাপারটাই আমাদের জানা নেই।"

"তারপর কী হল?"

"মার খেয়ে পালানোর জন্য আমি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে যাই। তখন আমাকে কেউ গুলি করে। বাধ্য হয়ে আমি তিনতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ি এবং অনেকটা দৌড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিই।"

বিস্মিত করালী বললেন, "তিনতলার ছাদ থেকে লাফ! তোমার হাত পা ভাঙল না?"

"এখানে মাধ্যাকর্ষণ খানিকটা কম, আর আমার শরীর খুব নমনীয়। তাই তেমন লাগেনি। তবে ওরা উপর থেকে গুলি চালাচ্ছিল বলে আমার প্রাণের ভয় ছিল। ভাগ্য ভাল যে আমি ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে দৌড়োতে পারি।"

"বাপ রে! তবে আমি অবিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার পায়ের মাংসপেশির গড়ন ও নমনীয়তা আমি পরীক্ষা করেছি। তোমার কথা সত্যি হতে পারে।"

"মিথ্যে কথা ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আসে না। আমাদের মস্তিষ্কের প্রোগ্রামিং-এর মধ্যে ওটা নেই।"

করালী দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ঠিক কথা। হীন সমাজেই মিথ্যার প্রচলন আছে। উন্নত সমাজে মিথ্যা এক অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা।"

এরপর কিছুক্ষণ ভোলানাথের শব্দতরঙ্গ শুনতে পেলেন না করালী। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?"

"না,আমি আমার পৃথিবীতে এই আশ্চর্য জগতের কথা জানাচ্ছি। ভাল-খারাপ সত্যি-মিথ্যে, গরিব-বড়লোক, টাকা-পয়সা, মারপিট, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কী অদ্ভুত এই গ্রহ। কিন্তু এখানে তীব্র উত্তেজনা আছে, বাঁচার ক্ষুধা আছে। আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনের মতো নয়। আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। বরং নিজের জগতে ফিরে যেতে হবে বলে মন ভার লাগছে।"

॥ নয় ॥

"বলি ওহে নাস্তিক! কাণ্ডটা দেখলে? কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার! এরাই অঘোরগঞ্জের নাম ডোবাবে দেখছি। শরীরচর্চা নেই, প্যাঁচপয়জার শিখল না, রিফ্লেক্স নেই, বুক ফুলিয়ে মস্তানি করে বেড়ায়। ছিঃ ছিঃ, দুটো গুন্ডা পাঁচজনকে পিটিয়ে পাট পাট করে দিয়ে গেল হে! দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে!"

"সবই স্বচক্ষে দেখলাম দাদা। বলতে দুঃখ হয় যে, গোপাল গুছাইত সম্পর্কে আমার ভাগনে।"

কথা হচ্ছিল গভীর রাতে। যোগেন পালোয়ান আর মুকুন্দ রায়ের মধ্যে দু'জনেই ভারী লজ্জিত আর মনমরা।

যোগেন বলল, "এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আমি গিয়ে হাউড় দিয়ে পড়ে গুন্ডাদুটোকে রদ্দার পর রদ্দা দিয়েছি বটে, কিন্তু শরীরটা না থাকায় তেমন সুবিধে হল না।"

মুকুন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি শুধু শরীর বোঝেন। চিরটাকাল দেখলুম, শরীর নিয়ে পড়ে রইলেন। এই ডনবৈঠক মারছেন, এই গদা ঘোরাচ্ছেন, এই এক কাড়ি ছোলা খেলেন, ছটা-সাতটা কাঁচা ডিম মেরে দিলেন, আর সারাদিন মাসল নাচিয়ে-নাচিয়ে বেড়ালেন। বলি, মস্তিষ্কের চর্চা কোনওদিন করেছেন?"

যোগেন রুখে উঠে বলল, "তার মানে কি তুমি বলতে চাও যে, আমি বোকা কিংবা আহাম্মক !"

"তা বলব কেন? বুদ্ধি আপনারও কিছু কম নেই। কিন্তু চিন্তাটা সব সময় শরীরের দিকেই বা কেন যাবে? মাথা খাটিয়ে একটা ফন্দিফিকির বের করতে হবে তো!"

"সেটাই তো বলতে আসা। তুমি হলে ভাবন কাজি। সারাদিন বসে-বসে আকাশ-পাতাল ভেবে যাচ্ছ। শরীরটা পলকা হলেও তোমার বুদ্ধির কিছু জোর আছে বটে। তা ভেবে একটা উপায় বের করে ফ্যালো তো! এরকম অত্যাচার-অবিচার তো আর সওয়া যায় না। অঘোরগঞ্জে একটা খুনখারাপি হয়ে গেলে যে লজ্জার শেষ থাকবে না। মাত্র দুটো গুন্ডা এসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে, আর আমরা বসে-বসে দেখব? মগের মুলুক নাকি?"

"তা গুন্ডা দুটো চায় কী?"

"কেন, তুমি খবর রাখো না?"

"না দাদা। আপনি তো জানেন, আমি কোনওকালেই গাঁয়ের কুটকচালিতে থাকি না।"

"হ্যাঁ, তুমি একটু আলগোছ লোক বটে। চিরু আর শচি হল ঘড়িয়াল মৃগাঙ্কর পোষা গুন্ডা। তুমি তো জানোই যে, মৃগাঙ্ক ঘড়ির জন্য জান দিতে পারে। নিতেও পারে। ওই যে 'শতম' নামে একটা গ্রহ আছে, সেখান থেকে রা নামে এক ছোকরা কী করে যেন এসে পড়েছিল। এসেই মৃগাঙ্কর পাল্লায় পড়ে যায়। সেই ছোকরার

হাতে একটা আজব ঘড়ি থেকেই বখেরা শুরু। মেরেই ফেলেছিল, বরাতজোরে বেঁচে যায়। এখন সে করালীডাক্তারের হেফাজতে। কিন্তু তার প্রাণ সংশয়। চিরু আর শচি খুঁজে পেলে তার আর রক্ষে নেই।”

“শতম গ্রহ? সেটা কোথায় বলুন তো!”

“তোমাকে বলে কী লাভ? তুমি ঘরকুনো লোক, মরে ইস্তক অঘোরগঞ্জের সীমানা পার হওনি আজ পর্যন্ত। আমি তো ফাঁক পেলেই এ গ্রহে সে গ্রহে টু মেরে আসি। শতমেও বারকয়েক গেছি।”

“সেটা কি ভাল জায়গা?”

যোগেন মুখ বিকৃত করে বলল, “তা খারাপ নয়। বেশ ডিসিপ্লিন আছে বটে। মজা কী জানো? সেখানে তেমন কোনও মজাই নেই। মুক-বধিরের রাজ্য বলে মনে হবে। তারা নাকি সব মনে-মনে কথা কয়, স্পিকটি নট টাকা-পয়সার প্রচলন নেই, কেনাকাটা নেই, পালপার্বণ নেই, যে যার মুখ বুজে কাজ করে যায়। কখনও কোনও ঘটনা ঘটে না। মন্দ নয়, তবে বড্ড ভ্যাদভ্যাদে।”

“বুঝলুম। তবে আপনার ভাল না লাগলেও, আন্দাজ করছি, সেটাই আমার উপযুক্ত জায়গা। চুপচাপ বসে ভাবনাচিন্তার খুব সুবিধে হয় ওরকম একটা জায়গায় গিয়ে বাস করলে।”

“তা যা বলেছ। যেতে চাও নিয়ে যাবখন। এক লম্ফে পৌছে যাওয়া যায়। কিন্তু উপস্থিত কী করা যায় সেটা ভেবে বের করে ফ্যালো তো!”

“ভাবছি। একটু সময় দিন।”

বাচস্পতিমশাইকেও ব্যাপারটা ভেঙে বলে আসি।”

সর্বেশ্বরের জিলিপি-কচুরির দোকানে সকালবেলাটায় বেশ ভিড় হয়। সর্বেশ্বরের হিঙের কচুরি আর সাড়ে সাত প্যাঁচের জিলিপি এ তল্লাটে যেমন বিখ্যাত, তেমনই নামডাক তার চায়ের।

অঘোরগঞ্জে একজন সন্ত্রাসবাদী বা ডাকাত বা ফেরারি আসামি ঢুকে যে করালীডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সেটা নিয়েই আজ সকলে উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছিল। পাগল, মারকুটে, রাগি এবং রোখাচোখা করালীডাক্তারের ভয়ডর বলে কিছু নেই। তার উপর বরাবর উনি বিপজ্জনক সব কাজ করে থাকেন। সেই জন্য সরেজমিনে গিয়ে কেউ ব্যাপারটা তদন্ত করে আসতে পারেনি। ব্যায়ামবীর বিরজা, শিবকালীবাবু, বটকৃষ্ণ মণ্ডলরা কয়েকজন গিয়েছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এখনও ভারী ধোঁয়াটে।

দোকানের বাইরের বেঞ্চে বসে দুটো লম্বা-চওড়া লোক শালপাতার ঠোঙায় কচুরি আর জিলিপি খেতে-খেতে চুপ করে বসে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। খদ্দেররা খানিকটা ভয় খানিকটা সন্দেহের চোখে বারবার তাদের দিকে

তাকাচ্ছে। তারা ক্রক্ষেপ করছে না। তাদের চেহারায় আর চোখে এমন কিছু আছে যাতে কেউ তাদের ঘটাতে সাহস না পায়, এটা তারা জানে।

সব শুনে চিরু চাপা গলায় বলল, "শুনলি?"

শচিও মৃদু স্বরে বলল, "হুঁ। কিন্তু মুশকিল আছে।"

"কীসের মুশকিল?"

"করালী ভেড়ুয়া নয়।"

"পিস্তলের সামনে সবাই ভেড়ুয়া।"

"চুপচাপ বসে থাক। করালীর বাজারে চেম্বার আছে। দশটায় চেম্বার খুলতে যাবে। তখন বাড়ি ফাঁকা।"

ক্রমে-ক্রমে বেলা দশটা বাজতে চলল। সর্বেশ্বরের দোকান ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু চিরু আর শচি স্থির হয়ে বসে আছে আর মাঝেমাঝে ঘড়ি দেখছে।

প্রায় সাড়ে দশটা যখন বাজে তখন শচি বিরক্ত হয়ে বলল, "নাঃ, আর দেরি করা ঠিক হবে না। কাজ হাসিল করে যেতে পারলে লাখ খানেক টাকা হাতে আসবে।"

"আমিও তো তাই বলি। দরকার হলে করালীকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। চল।"

দু'জনে ধীরেসুস্থে দাম মিটিয়ে উঠে পড়ল।

"বগলাপতি, শুনতে পাচ্ছ?"

"কে?" বলে বগলাপতি পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে এদিকসেদিক চাইতে লাগলেন।

শঙ্কাচরণ আর বিপদভঞ্জন দু'পাশ থেকে বলে উঠল, "কী হল বগলাঠাকুর?"

"কে ডাকল বল তো!"

"কে ডাকবে? ভুল শুনেছেন।"

"তাই হবে!" বলে বগলাপতি ফের এগোতে লাগলেন। হঠাৎ ফের সেই কণ্ঠস্বর, "বলি ও বগলা! বেশ স্পষ্ট শুনছ তো আমার গলা?"

"অ্যাঁ!" বলে ফের বগলাপতি দাঁড়িয়ে গেলেন।

শঙ্কা আর বিপদ মুশকিলে পড়ে গেল। শঙ্কা বলল, "বলি দিনেদুপুরে কি ভূতের ডাক শুনতে পেলেন নাকি বগলাঠাকুর।"

"চুপ! চুপ! শুনতে দে ভাল করে। কে যেন কী বলছে।"

কণ্ঠস্বরটি বলল, "আমি যোগেন হে! মনে আছে?"

বগলাপতি কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "যে আজ্ঞে ! কিন্তু আ-আমি যে মূর্ছা যাব..."

"খবর্দার ও কাজ কোরো না। তা হলেই কেলেঙ্কারি। মন দিয়ে শোনো। আমি তোমার ভিতরে ঢুকে পড়েছি। তোমার ভিতরটা অতি যাচ্ছেতাই। গাদা-গাদা চর্বি জমে আছে চারধারে। ব্যায়ামট্যায়ামের তো বালাই নেই তোমার। এ শরীরে বসবাস করতে তোমার ঘেন্না হয় না? যাকগে, কী আর করা। এখন কিছুক্ষণের জন্য ক্ষমাঘেন্না করে এই চর্বির পিণ্ডের মধ্যেই থাকতে হবে আমাকে।"

"ওরে বাবা! আমার ভিতরে যোগেন পালোয়ান! তা হলে মূর্ছা ঠেকাব কী করে?"

"মুর্ছা গেলে তোমার মুণ্ডু ছিড়ে নেব। স্টেডি হয়ে দাঁড়াও। অত কাঁপছ কেন? করালীর বাড়িতে দুটো গুন্ডা ঢুকছে। তাদের মতলব ভাল নয়। খুনখারাপি হতে পারে। তুমি পা চালিয়ে যাও। গুন্ডাদুটোকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনও ভয় নেই।"

"বাপ রে! জীবনে গুন্ডা-পেটাই করিনি যে!"

"আহা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমার হয়ে লড়বে তো যোগেন পালোয়ান। বলি, গায়ে একটু জোরবল টের পাছ?"

"তা পাচ্ছি বোধ হয়।"

"তা হলে আর কী? মাভৈঃ বলে তেড়ে যাও তো!"

বগলাপতি হঠাৎ হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, "এই যাচ্ছি! দেখি তো কার এত সাহস যে অঘোরগঞ্জে এসে মস্তানি করে যায়?"

শঙ্কাচরণ আর বিপদভঞ্জন হা হয়ে বগলাপতির ছুট দেওয়া দেখল, তারপর তারাও চটপট পিছু নিল।

বগলাপতি যখন অকুস্থলে পৌছলেন তখন চিরু আর শচি কাজ অনেকটাই এগিয়ে ফেলেছে। পিস্তলের বাট দিয়ে মেরে করালীডাক্তারকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। পিস্তল বাগিয়ে সবে চিরু এগোচ্ছে ভোলানাথের দিকে। সুরবালা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

বগলাপতি ঝড়ের মতো ঢুকলেন, আর তার পরই তাঁর মুগুরের মতো ঘুসিতে চিরু ছিটকে পড়ল। পিস্তল খসে গেল হাত থেকে। বগলাপতি এবার শচির দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দরজার কাছ থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, "না না বগলাঠাকুর, ওকে মারবেন না, ওটা আমার ভাগে।" বলতে-বলতেই গোপাল গুছাইত ঘরে ঢুকেই ল্যাং মেরে শচিকে ফেলে বুকের উপর চেপে বসে মোক্ষম এক ঘুসোয় তার চোখ উলটে দিল।

লড়াই শেষ। শঙ্কাচরণ আর বিপদভঞ্জন তাড়াতাড়ি দড়ি এনে দু'জনকে পাছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

জীবনে যিনি কখনও বগলাপতিকে চিটিংবাজ ছাড়া সম্বোধন করেননি, সেই করালীডাক্তারের আজ কী হল কে জানে, মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাড়িয়ে সবিস্ময়ে বগলাপতির দিকে চেয়ে বললেন, "ধন্যবাদ বগলীবাবু! আপনি সময়মতো না এলে এই ছেলেটা খুন হয়ে যেত। কিন্তু এসব কী হচ্ছে বলুন তো!"

ঠিক এই সময়ে ভোলানাথের টেলিপ্যাথি করালীডাক্তার থেকে শুরু করে সবাই শুনতে পাচ্ছিল। ভোলানাথ বলল, "এসব ঘটে বলেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আলাদা একটা আস্বাদ আছে।

বেঁচে থাকাটাকে আপনাদের মতো টের পাই না। আমার ভারী ভাল কাটল কয়েকটা দিন। মার খেলাম, গুলি খেলাম, প্রাণ বাঁচাতে পালালাম, বেশ লাগল

কিন্তু। এবার আমার ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। ওই দেখুন, আমাকে নিয়ে যেতে নল এসে গেছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ফের কখনও আসব। বারবার আসব। জীবনের স্বাদ নিয়ে যাব। বিদায়।"

সবাই অবাক হয়ে দেখল, জানালার গ্রিল ভেদ করে একটা গোল মৃদু আলোর ফোকাস এসে বিছানায় পড়েছে।

ধীরে-ধীরে আলোটা ভোলানাথকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। যেন আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। আবছা হয়ে যাচ্ছে। নেই হয়ে যাচ্ছে।

মুকুন্দ রায় তার ভাগনে গোপাল গুছাইতের শরীর থেকে লাফ দিয়ে নেমে উত্তেজিত গলায় বলল, "এই হল সায়েন্স! একেই বলে বিজ্ঞান। দেখছেন তো যোগেনদা, সায়েন্স কাকে বলে! আমিও এই নলের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে আর নয়। ভোলানাথের সঙ্গেই আমি শতম গ্রহে চলে যাচ্ছি।"

বগলাপতিকে ছেড়ে যোগেন পালোয়ান ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "আহা, নল দিয়ে যাওয়ার দরকারটা কী হে! এক লম্ফেই তো চলে যাওয়া যায়!"

মুকুন্দ নলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে-যেতে বলল, "না, না! আমি ওসব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাসী নই। আমি সায়েন্সে বিশ্বাসী। বিজ্ঞান আর যুক্তি ছাড়া বিশ্বে আর কিছু নেই।"

যোগেন বিরস মুখে বলল, "তা হলে এসো গিয়ে বাপু দুনিয়ায় নাস্তিকের সংখ্যা যত কমে ততই মঙ্গল!"

*** সমাপ্ত ***